তিন বৌদ্ধস্থান

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

পরম শ্রদ্ধেয়

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম, এ

(কলি), ডি, লিট্ (লণ্ডন), ত্রিপিটকাচার্য্য

(সিংহল) মহাশয়ের

করকমলে

ভূমিকা

"চার-পুণ্যস্থান" গ্রন্থখানি মুদ্রিত করে' শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ তিন বৌদ্ধস্থান পরিদর্শন শেষ করেছেন। বৌদ্ধ যুগে ভারতবাসী তার অধ্যাত্ম সম্পদের সঙ্গে, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ সাধন করেছিল এবং সেই সম্পদের বিতরণ কী উদার ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তার কাহিনী গ্রন্থকার সাধারণ পাঠকপাঠিকাদের শুনিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যমণ্ডলীর সাধনক্ষেত্র যে মগধরাজ্য, যেখানে রাজগৃহ বহু তীর্থসম্পদ আজও বুকে করে রয়েছে তার সুন্দর বর্ণনা করে, পূর্ব্ব ভারত থেকে লেখক আমাদের পশ্চিম ভারতে নিয়ে গেছেন। সেখানে তক্ষশিলায় দেখি নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়। প্রাচীন জরথুস্ত্রীর অগ্নি উপাসনা থেকে আরম্ভ করে পার্থিয়, গ্রীক, রোমক, শক, কুষাণ প্রভৃতি কত বিচিত্র সভ্যতার সংমিশ্রণ এখানে হয়েছিল ; অথচ সংঘর্ষ না হয়ে সর্ব্বত্র শান্তির ও সহযোগিতার নিদর্শন দেখে আমরা বুঝি যে ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ভাবনা কত বড়

কল্যাণ এনেছিল সারা ভারতে তথা এশিয়ার দেশে দেশে। তাই সম্ভব হয়েছিল অজন্তার অমর শিল্পীদের দিগ্বিজয়। এখানকার গুহাচিত্রকলা মধ্য-এশিয়া পার হয়ে লুঙমেন্, দাতৃঙ্ফু, তুয়েন্ হয়াঙ্ প্রভৃতি চৈনিক পার্ব্বত্য বিহারে ভারতশিল্পের প্রভাব বিস্তার করে সুদূর কোরিয়া ও জাপানে প্রবেশ করেছিল।

ভারতের সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ যে যুগে হয়েছে তার চিত্তাকর্ষ বিবরণী রচনা করে লেখক আমাদের ধন্যবাদ ও তীর্থযাত্রীপুণ্য অর্জ্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আজ নূতন সম্ভাবনায় দীপ্ত, তাই সাধারণ নরনারীদের এই রকম গ্রন্থের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করার সময় এসেছে।

"রাখী পূর্ণিমা"
১৩৫৪
কলিকাতা

শ্রীকালিদাস নাগ।

নিবেদন

ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এশিয়াবাসী বিশেষতঃ বৌদ্ধ জগতের অধিবাসিবৃন্দ বুদ্ধের জন্মভূমির প্রতি সাগ্রহে জ্যোতির্ম্ময় শান্তির নবসূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় রহিয়াছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে অহিংসার বাণী বুদ্ধ প্রচার করিয়া মানবের কল্যাণ ও শান্তির পথ প্রসারিত করিয়াছিলেন। আজ বিশ্বব্যাপী অশান্তি, বিপর্য্যয় ও দুরবস্থায় দিশাহারা নর-নারী তাহাদের মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশের আশায় ভারতবর্ষেরই মুখাপেক্ষী হইয়া আছে।

ভগবান বুদ্ধেরই আদর্শে মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসানীতির মন্ত্রবলে ভারতকে স্বাধীনতা ও শান্তির পথে লইয়া আসিয়াছেন, তাহার চরম পরিণতি ভারতেই হইবার আশায় বিশ্ববাসী আজ উদ্‌গ্রীব। পঞ্চশীল পালনে ব্যস্ত।

১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীনগরীতে এশিয়াবাসীদের মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইযাছিল। তাহাই ভবিষ্যৎ মহাসঙ্গিতীর পূর্ব্বাভাস। স্বাধীন ভারতের প্রধান দায়িত্ব বিশ্ববাসীকে শান্তির পথ প্রদর্শন, বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য সেই শান্তির অভিযানে প্রধান অংশগ্রহণ; শান্তিজল ছিটানর কাজ করা।

বুদ্ধদেবের জন্ম ও লীলার স্থান ভারতে বৌধর্ম্মাবলম্বী বিরল, বাঙ্গলাদেশে তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের বক্তা এখনও বহন করিয়া ধন্য হইতেছেন, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতেছেন।

বাঙ্গালী জনসাধারণ বৌদ্ধ-শাস্ত্র, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞানের সহিত পরিচয়-অল্প। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, সিদ্ধিলাভের স্থান গয়া, ধর্ম্ম-প্রচারের স্থান সারনাথ, মহানির্ব্বাণ-স্থান কুশীনগরের মহত্ত্বের সহিত বাঙ্গালী বিশেষ পরিচিত নয়। 'চারপুণ্যস্থান' পুস্তক মহাবোধি সোসাইটির অনুপ্রেরণায় সে অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে।

বুদ্ধলীলার স্থান-উদ্ধার, বুদ্ধের বাণী ও মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে সিংহল-বাসী রেভারেণ্ড ভিক্ষু অনাগারিক ধর্ম্মপাল ১৮৯১ সালে 'মহাবোধি সোসাইটি' ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে ইহার শাখা এশিয়া ও ইউরোপের বহুস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। স্থাপনকাল হইতেই বাঙ্গালী এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায ইহার সভাপতি ছিলেন। পরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার সভাপতি হন।

এই সমিতির উদ্যোগে জগতে বহু স্থানে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা, বুদ্ধের বাণী-প্রচার, পুস্তক-প্রকাশ করা হইয়াছে; সঙ্কটতারণ ও অনাথ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে; সারনাথ, বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী ও কুশীনগর প্রভৃতির পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া যাত্রিআবাস গঠন, বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হইতেছে।

সারনাথ কেন্দ্রের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ভিক্ষু এস, সঙ্ঘরতন ও কলিকাতা ধর্ম্মরাজিকা বিহারের প্রধান ভিক্ষু এন, জিনরতন থেরার অনুপ্রেরণায় ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিনহার উদ্যোগে তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও অজন্তার শিল্পগৌরবের মহিমাপূর্ণ "তিন বৌদ্ধস্থান" প্রকাশিত হইল।

রাজগৃহ ও তক্ষশিলা প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগর? অজন্তা বৌদ্ধযুগের শেষভাগের, বৌদ্ধ-শিল্পের ও চিত্রের চরম বিকাশ-স্থান। প্রত্যক্ষদর্শনে যে আনন্দ-রস উপভোগ করিয়াছি তাহারই কণামাত্র বাঙ্গালী ভাই-বোনদের নিকট পরিবেশিত হইল।

এই পুস্তক-রচনায় যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি। পরিশেষে আমার কন্যা রমা রাণী ভ্রমনসাথী থাকিয়া ও পাণ্ডুলিপি লিখিয়া সাহায্য করিয়াছে, তাহার শান্তিময় দীর্ঘজীবন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

ওঁ তৎ সৎ

নমঃ বুদ্ধায় নমঃ

৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা।

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৫৪ সন।

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

তক্ষশিলা

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলার ঐশ্বর্য্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিত। সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের রোম, গ্রীস, মিশর, ইরাক, ইরাণ, পারস্য, মহচীন, উত্তর চীন, তিব্বতবাসিগণের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মিলনস্থল এই তক্ষশিলা। তক্ষশিলা গ্রীক্, ইরাণী, বহ্লিক, শক, পারদ, কুষাণ-আদি বিদেশীয় সভ্যত ও কৃষ্টির সহিত ভারতের আর্য্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব শিল্প-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কেন্দ্রস্থল তক্ষশিলা। তক্ষশিলাই প্রাচীন ভারতের মহান্ পীঠস্থান। প্রায় সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম, তক্ষশিলার রাজা ও প্রজার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সুখ-শান্তি দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে তক্ষশিলায় বহু স্তূপ, বিহার, সঙ্ঘারাম, শিল্প, ঐশ্বর্য্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চরিত্র, শান্তি ও অহিংসাময় জীবন-যাত্রা গড়িয়া উঠিয়াছিল! তক্ষশিলা বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

তক্ষশিলার গৌরবের কথা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে, ভরত তাঁহার পুত্র তক্ষের জন্য তাঁহারই নামানুসারে "তক্ষশিলা" নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে,

তক্ষশিলাতে মহারাজ জন্মেজয় তক্ষকবংশ নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। বহু বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে বিদ্যা ও শিল্প-শিক্ষার পীঠস্থান বলিয়া তক্ষশিলার খ্যাতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়ে বিশাল মৌর্য্যসাম্রাজ্যের উত্তর-ভারত-প্রদেশের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। বহুদিন স্বাধীন হিন্দু. গ্রীক্, শক, পারদ, কুষাণ রাজাদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা।

তক্ষশিলার পরিচয় অবগত হইলে, স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারা যাইবে। কোন জাতি কেবল পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিলে যেমন পঙ্গু হইয়া পড়ে, তেমনই অতীতের কৃষ্টির ধারা হারাইলে, নিজের জাতির প্রতি মমত্ব ও তাহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। তক্ষশিলার কথা লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য, জাতির স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও শান্তি-অর্জনের লুপ্ত-শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করা। লেখকের পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার অধিকার, শিল্পীর দক্ষতা কিছুই নাই; সাহিত্যিকের ভাষা-রচনায় দখলও নাই; কেবল তক্ষশিলার প্রত্যক্ষ-দর্শনের (১৩৫২ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিকমাসে) যে আনন্দ পাই তাহা বিতরণ ও অতীত গৌরবের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য, এই রচনার অবতারণা। হায়! সেই মহাতীর্থ বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতমাতার কক্ষচ্যুত!

দেড় সহস্র বৎসরের তক্ষশিলার ঐশ্বর্য্য মৃত্তিকাগর্ভে

লুক্কায়িত ছিল। জেনারেল কানিংহ্যাম ও স্যার জন মার্শালের কৃপায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তক্ষশিলার স্বরূপ মানব চক্ষে উদ্ভাসিত হয়। স্যার জন মার্শাল তাঁহার "গাইড্ টু ট্যাকশিলা" গ্রন্থে তক্ষশিলার আবিষ্কারের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান রচনাটি লিখিবার সময় ঐ পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

তক্ষশিলা বৃটিশ ভারতের পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম-প্রান্ত-প্রদেশের সীমানার সংযোগস্থলে অবস্থিত। কাশ্মীর যাইবার পথের শেষ রেল-ষ্টেশন রাউলপিণ্ডি হইতে পশ্চিম অভিমুখে পেশওয়ার পর্য্যন্ত যে রেল লাইন গিয়াছে, তাহার বিংশ মাইলের পর তক্ষশিলা বা ট্যাকশিলা ষ্টেশন অবস্থিত। পেশওয়ার হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের দুইটি শাখার সংযোগস্থলে তক্ষশিলা।

রাউলপিণ্ডি হইতে রেলপথ পর্ব্বত ও উপত্যকার বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রদেশের এই অঞ্চল সমুদ্র-জলপৃষ্ঠ হইতে দুই সহস্র ফিট উচ্চ; রেলপথ কখন দৃঢ় পর্ব্বতের উপর চড়িয়া, কখন বা উপত্যকার শ্যামল বক্ষ ভেদ করিয়া, কখন বা গভীর খাদের পার্শ্ব দিয়া, কখন বা দীর্ঘ সুরঙ্গের ভিতর দিয়া তক্ষশিলা ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ষ্টেশন সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৯২ ফিট উচ্চ। চারিদিকে উচ্চ শৈলরাজির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রমণীয় উপত্যকাটি পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। অদূরে হাজরা ও মারী গিরি-

শ্রেনীর শাখা-প্রশাখা তক্ষশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে যেমন মনোরম করিয়াছে, তেমনই হারো, তাম্রনালা, লুণ্ডীনালা ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা এই পার্ব্বত্য উপত্যকাটীকে উর্ব্বর করিয়াছে।

প্রাচীন স্বদেশী ও বিদেশী নরপতিগণের লীলাভূমি, ইতিহাস-বিশ্রুত জনপদ, কীর্ত্তিবহুল বিস্তীর্ণ তক্ষশিলা উপত্যকা প্রকৃতই প্রকৃতির রম্য স্থান। ইহার উত্তরে হাজরা গিরিশ্রেণী ; পূর্ব্বে তুষার-কিরীটী মারী শৈলের শাখা-প্রশাখা ; দক্ষিণে মারগলা পাহাড় ; আর পশ্চিমে হাতিয়াল পর্ব্বত শ্রেণী। উপরে স্বচ্ছ আকাশের নীলচন্দ্রাতপ ; নিম্নভাগে শৈল-অঙ্ক-মধ্যস্থিত শ্যামল ক্ষেত্র ; স্থানে স্থানে ফলন্ত বিটপিকুঞ্জ ; দূরে পাহাড়গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী ; মাঝে মাঝে রজতসূত্রের ন্যায় স্রোতস্বিনীদের চঞ্চল গতিরেখা উপত্যকাটিকে এক ভাবরাজ্যের আধারে পরিণত করিয়াছে। চারিদিকে যেন স্থির, শান্ত, সৌম্য, গম্ভীর, অপূর্ব্ব এক পূতভাব বিরাজ করিতেছে। অতীতের বিনষ্ট ঐশ্বর্য্য ও লুপ্ত গৌরব দর্শকের চিত্ত হর্ষে ও বিষাদে পূর্ণ করিয়া দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে উদয় হয়—

"তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
আজি দুঃখের রাতের সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয়হরণী॥"

ষ্টেসনের সংলগ্ন ভূমি হইতে ছয়-সাত মাইল ব্যাপিয়া তক্ষশিলার প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে। তক্ষশিলা উত্তর-পশ্চিম-ভারতের সামরিক ঘাঁটি ও বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে রাজবর্ত্ম (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রবেশদ্বার পেশোয়ার হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারই উপর তক্ষশিলা।

হাতিয়াল পর্ব্বতের অংশ ধ্বসিয়া উপত্যকার সমতল ভূমিতে পরিণত হওয়ায় এবং হারো নদীর শাখা-প্রশাখা উপত্যকার বক্ষের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হওয়াতে শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি প্রচুর। এই অঞ্চল আলেক্জেণ্ডারের সময়েও অতিশয় উর্ব্বর ছিল। গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ান আলেকজেণ্ডারের সহিত আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের মধ্যে তক্ষশিলা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ নগর।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন—"তক্ষশিলা ও চতুঃপার্শ্বস্থিত ভূখণ্ড জনবহুল, বহুবসতিপুর্ণ ও উর্ব্বর"। প্লুটার্ক মন্তব্য করিয়াছেন যে, পর্ব্বত ধ্বসিয়া এই অঞ্চল উপত্যকায় পরিণত হওয়ায় অতিশয় উর্ব্বর। ৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে হিউয়েন সাং ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে, তিনি তক্ষশিলার উর্ব্বরতা, শস্য-উৎপাদন-শক্তির প্রাচুর্য্য,

স্রোতস্বতী নদীর বহুলতা এবং গাছপালার সজীবতার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন উটখাণ্ডু (উদখণ্ড) নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া সিন্ধুনদ পার হইলাম। এই স্থানে নদী প্রস্থে তিন বা চার লি। দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত! জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এই নদীর পূর্ব্বে তক্ষশিলা প্রদেশ ২০০০ লি পরিব্যাপ্ত। ইহার রাজধানী তক্ষিশলা নগর বৃত্তাকারে ১০ লি। এখানকার শাসনকর্ত্তারা ও সর্দ্দাররা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। রাজবংশ লুপ্ত।"

এই প্রদেশ পুর্ব্বে একটি স্বাধীম রাজ্য ছিল, বর্ত্তমানে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। ভূমি উর্ব্বর, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বহু নদীর প্রবাহে শস্য-শ্যামলা, জল-বায়ু মনোরম। জনপদবাসীরা ঐশ্বর্য্যশালী ও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী। এখানে বহু মঠ ও বিহার অবস্থিত, কিন্তু অধিকাংশই পরিত্যক্ত; যে অল্প সংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মহাযানপন্থী।"

হিউয়েন সাং শিরসুখ নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলাকে গান্ধার রাজ্যের সংলগ্ন লিখিয়াছেন। কিন্তু ফা-হিয়ান বলেন, গান্ধার হইতে তক্ষশিলায় আসিতে তাঁহার সাত দিন লাগিয়াছিল। দুইজন চৈনিক পরিব্রাজকই তক্ষশিলা নগর গান্ধার রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত বলিয়াছেন। পরন্তু কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থে তক্ষশিলা গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত, এমন কি গান্ধার রাজ্যের

রাজধানী বলিয়া স্বীকৃত। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা এই মতেরই অনুবর্ত্তী।

তক্ষশিলা উপত্যকার উত্তর দিকে হারোনদী প্রবাহিত, দক্ষিণে মারগলা পাহাড় হইতে প্রবাহিত এক ঝরণার জল "কাণা" নদীতে পরিণত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের শৈলমালা হইতে অনেকগুলি পর্ব্বত-শৃঙ্গ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী উপত্যকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিম অংশ হাতিয়াল নামে পরিচিত। উত্তর ভাগের উপর দিয়া হারোনদীর একটি শাখা নানা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত। ইহার নাম, "লুণ্ডীনালা"। দক্ষিণাংশের উপর দিয়া হাতিয়াল পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রসিদ্ধ "তাম্রনালা" বহিয়া গিয়াছে।

হারোনদী, তাম্রমালা ও লুণ্ডীনালার মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে, হাতিয়াল পর্ব্বতের উপরে, কুক্ষিতে ও পাদদেশে তক্ষশিলা নগরত্রয় ও সহরতলী যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে তক্ষশিলার নগরগুলি এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের খননদ্বারা আমরা পর পর তিনটি নগরের পত্তন দেখিতে পাই। বর্ত্তমানে সেই তিনটি নগর 'বীরমণ্ডল', 'শিরকাপ' ও 'শিরসুখ' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বীরমণ্ডল হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের নগর; শিরকাপ গ্রীক ও শিরসুখ কুষাণ যুগে নির্ম্মিত

হইয়াছিল। যখন যে যুগে যেখানেই যে নগর পত্তন হইয়াছে তখন সেই সহরের নাম তক্ষশিলাই ছিল। এই তিনটি নগর সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা পরস্পর ১ মাইল ১॥০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। স্তূপ, মঠ ও বিহারগুলির অধিকাংশই এই নগরত্রয়ের উপকণ্ঠে বা উপত্যকায় বা পর্ব্বতের উপর নানাস্থানে বিরাজিত।

এযুগে সর্ব্বপ্রথম জেনারেল কানিংহাম সাহেব তক্ষশিলার বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থান ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমানে সাহাদেরী ও কালকা সরাই নামে যে পল্লী পরিচিত, তাহার একমাইল উত্তর-পূর্ব্বে তক্ষশিলা অবস্থিত। এই মত পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। (এ-জি-আই, পৃঃ ১০৪)

রেল ষ্টেসনের সন্নিকটেই প্রাচীনতম বীরমণ্ডল নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই নগরের সীমার মধ্যে বর্ত্তমান মিউজিয়াম এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দপ্তর ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণের আবাস। ইহার পশ্চিমে তাম্রনালার তীরে ১৭৫১ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে খুরুম গুজার ও খুরুম প্রাচ্যা পার্ব্বত্য-পল্লী দুইটিতে বড় বড় বৌদ্ধ মঠ, তাহার আরো দক্ষিণে ২০৭৫ ফিট পর্ব্বতের উপর গিরিদুর্গ, বৌদ্ধমঠ, স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বীরমণ্ডল নগরের উত্তরে, তাম্রনালার পূর্ব্বে সমতল স্থানে ও হাতিয়াল পর্ব্বতের উপরে গ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকাপ নগর, তাহার এক অংশে কুণাল স্তূপ। ইহার উত্তরে, তাম্রানালা ও লুণ্ডীনালার মধ্যে ঝাণ্ডিয়াল। তাহার উত্তর-পূর্ব্বে লুণ্ডীনালার তীরে কাচাকোট পল্লীর মধ্যে কুষাণদের শিরসুখনগরের পত্তন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর মোর্হা-মোরাদু, পিপ্পা, জৌলিয়া পল্লীগুলিতে বহু স্তূপ, মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম অবস্থিত; তাহার উত্তরে বাদলপুর ও সুউচ্চ বল্লহার স্তূপ দেখা যায়। তক্ষশিলার ১০ মাইল মধ্যে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার স্থানে স্থানে অবস্থিত! একসময় শত সহস্র নর-নারী এখানে আসিয়া শান্তি পাইত। গাহিত—

"নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোক ভয়, বিপদ, মৃত্যু দূর হয় তা'র,
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃত রস পায় হে॥"

ইতিহাস

তক্ষশিলার ইতিহাস অতি প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতে তক্ষশিলার নাম পাওয়া যায়। সেই জন্য স্যার জন মার্শাল লিখিয়াছেন, তক্ষশিলা নগরের পত্তন খৃষ্টের জন্মের দুই বা তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

পুরাকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, আর্য্য-জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধির প্রতীক, এই প্রাচীন তক্ষশিলা-নগরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গ্রীক ঐতিহাসিক ও চিন পরিব্রাজকগণের বিবরণ, অধুনা-আবিষ্কৃত মুদ্রা, স্থাপত্য—শিল্প, ঐশ্বর্য্য, শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে জোড়াতালি দিয়া তক্ষশিলার ইতিহাস রচনা করা ব্যাতিত আর উপায় নাই। অবশ্য একথা প্রমাণ হয় যে, সুদূর অতীতকালে সমগ্র উত্তর—পশ্চিম অঞ্চল প্রতিধ্বনিত করিয়া তক্ষশিলার গৌরব—দুন্দুভি নিনাদিত হইত এবং নগর-তোরণের উন্নত শীর্ষে তাহার বিজয় পতাকা উড়িত।

রাজা দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরতের 'তক' ও 'পুস্কল' নামে দুই পুত্র ছিল। ভরত গন্ধর্ব ও গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা ও পুস্কলবতী নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার দুই পুত্রকে দান করেন। 'তকুষশিলার' নগরবাসীরা ধর্ম্ম-পরায়ণ।

নগর অতি মনোরম। সুরম্য অট্টালিকা, সপ্ততল সৌধ, সজ্জিত পণ্যবীথিকা, প্রকৃষ্ট যজ্ঞশালা, মনোহর পুষ্প-উদ্যান, শীতল জলাশয়—নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। ভরত স্বয়ং সেই স্থানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, রাজা জন্মেজয় অতিকষ্টে তক্ষশিলা জয় করেন, এবং সেইস্থানে এক বিরাট সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠানে করিয়াছিলেন। তক্ষকজাতীয় সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সেই যজ্ঞের কিম্বদন্তী এখনও প্রচলিত আছে এবং সেই যজ্ঞস্থানও পাণ্ডারা নির্দ্দেশ করেন। তখন হইতে এই স্থান তক্ষশিলা নামে খ্যাত।

তক্ষশিলা নামের উৎপত্তির নানা ব্যাখ্যা বহু পণ্ডিত দিয়া থাকেন। সংস্কৃত গ্রন্থে তক্ষশিলার নামের অর্থ: করা হইয়াছে—কর্ত্তিতশিলা। ডাঃ উইলসন এর মতেও "কর্ত্তিত-শিলা", স্যার জন মার্শাল বলেন—নগরটি কর্ত্তিত বা চাঁচা শিলার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া তক্ষশিলা নাম হইয়াছে। বুলার সাহেবের মতে তক্ষশিল্লা "নাগরাজ তক্ষকের শৈল"। তিব্বতীয় সাহিত্যে এই নগরের নাম 'রডা হজোগ' অর্থাৎ কুঁদাই করা (Carving Stone) পাথর। চীনাদের গ্রন্থে ইহার নাম চু-সূ-সী-লো অর্থাৎ কর্ত্তিত শির, পালিগ্রন্থে তক্কশিলা অর্থে তর্কশিলা। একটি জাতকে লেখা আছে যে, ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এইস্থানে অন্ন ভিক্ষা-দানের পরিবর্ত্তে নিজ শির

কাটিয়া দান করিয়াছিলেন বলিয়া 'তক্ষশির' নামে এই নগর খ্যাতিলাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান তক্ষশিলা অর্থে 'কৰ্ত্তিত শির' লিখিয়াছেন। একখানি পালি-ভাষার গ্রন্থে অশোকের অনুশাসনে পালিভাষা অনুযায়ী নাম দেওয়া হইয়াছে তকশিলা। কারুর কারুর মতে 'তক্ক' জাতি দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই নগর 'তক্ষশিলা' নামে অভিহিত হয়। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত জোরাষ্ট্রিয় ভাষায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে নগরের নাম "তচ্ছুশির" আছে। তক্ষক অর্থ 'ছুতার'. এবং বাসুকীর ভ্রাতা নাগরাজ তক্ষক।

প্রাচীনকালে তক্ষশিলা যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানেই 'ভদ্রশিলা' নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এবং বর্ত্তমানে ইহার এক নাম 'মরিকালা'। পাণিনি, রঘুবংশ, বায়ুপুরাণ, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেও তক্ষশিলার উল্লেখ আছে।

গ্রীক ও রোমের ঐতিহাসিকরা, রাজদূত ও লেখকগণ সকলেই এই নগরের "ট্যাক্শিলা" নামটি দুই হাজার বৎসর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও এই নগরের নাম 'ট্যাকশিলা' ব্যবহার করেন। স্থানীয় লোকেরা ইহার কোন কোন অংশকে "টেশকিলা" বলিয়া থাকে। নামের উৎপত্তির বিবরণ যাহাই হউক "তক্ষশিলা" ও "ট্যাকশিলা" নামেই এইস্থান এযুগে পরিচিত হইয়াছে, এইস্থান হাজার হাজার বৎসরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বুদ্ধের চরণে প্রণতি জানাইয়া আসিতেছে।

"নির্ম্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ
বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ॥"

অনেক চীনদেশীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তক্ষশিলা একটি বিখ্যাত শিক্ষা, বাণিজ্য ও শিল্প-কেন্দ্র। আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের ও চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের একটি বিশিষ্ট পীঠস্থান।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলা এক বিশাল শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ—এমন কি মিশর, ব্যাবিলন (বাবেরক), সিরিয়া, আরব, চীন, প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা তক্ষশিলায় আসিত। বৈয়াকরণ পাণিনি তক্ষশিলায় বাস করিবার জন্য গিয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের জন্মস্থান ও শিক্ষাকেন্দ্র এই তক্ষশিলা। অনেক রাজপুত্র ও বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী তক্ষশিলায় আসিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিত। বিদিশার যুবরাজ তক্ষশিলার এন্টিসিলিডিয়াসের রাজত্বকালে যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য তক্ষশিলায় আগমন করেন। তাহার ফলে হিলিওডোরাসের সহিত মালোয়ার যুবরাজের বন্ধুত্ব হয়; এবং তাঁহার পিতার রাজসভায় হিলিওডোরাস গ্রীক রাজার দূতরূপে গমন করেন।

পরে এই হিলিওডোরাস ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মালোয়ার রাজকুমারী মালবিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি রাজার কুলদেবতা বাসুদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে যে গড়ুর-স্তম্ভ স্থাপন করেন এখনও তাহা সেইস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইস্থান এক্ষণে ভীলসা গ্রাম নামে পরিচিত।

ধর্ম্মপদ 'অট্ঠ' কথায় দেখা যায়, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করেন। বিনয় পিটক-মতে মগধের রাজবৈদ্য জীবক তক্ষশিলায় ভৈষজ্য এবং শল্য বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। একস্থানে দেখা যায়, রাঢ় দেশের (হুগলী জেলার) জনৈক যুবক বিদ্যালাভার্থে তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন। বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক সেখানে অধ্যাপনা করিতেন। বারাণসী-অধিপতির জনৈক পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থে তক্ষশিলায় আগমন করেন।

জাতক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বোধিসত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে তক্ষশিলায় নানা বিদ্যা শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন। বোধিসত্ব বারাণসী-অধিপতি ব্রহ্মদত্তর পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করিয়া তিনবেদ, অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন। বারাণসীর রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র বোধিসত্ত্ব তিনবেদ ও দ্বাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। 'ভীমসেন জাতকে' আছে, বোধিসত্ত তক্ষশিলায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে একজন ধনুর্বিদ্যাবিশারদরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

'সরভঙ্গ' জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের পুত্র হইয়াও তক্ষশিলার যন্ত্র-বিদ্যায় ছুতারের কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তীর দ্বারা লাঠি (সরল্‌ঠুটি), রজ্জু (সরজ্জম) বেণী প্রাসাদ (সরপাশাদ) মণ্ডপ, সোপান, পুষ্করিণী (পাকথরশী) পদ্ম নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। তাঁহার অধ্যাপকের নিকট খড়্গা, মেষের শৃঙ্গ নির্মিত ধনুক, সন্ধি স্থানে নির্ম্মিত তূণ, বর্ম্ম, উষ্ণীষ উপহার পাইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তথায় পাঁচশত যুবককে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

'সুষীম' জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্ব ষোল বৎসর বয়সে তক্ষশিলায় গিয়া একদিনে হাতি-মারা বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

বারাণসীর জনৈক যুবক তক্ষশিলায় সর্প বশীভূত করিবার মন্ত্র শিক্ষা করেন। কোশলাধিপতির এক পুত্র তক্ষশিলায় নিসিন্দা উর্দ্ধারণ মন্ত্র শিক্ষা করেন।

তক্ষশিলার শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র হইতে উৎসারিত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতির মন্দাকিনীর ধারা কয়েক শতাব্দী ভারতবর্ষরে বক্ষ প্লাবিত করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অমৃত রস পান করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ জ্ঞান-পিপাসু নরনারী ইয়োরোপ, এশিয়া ও মিশর হইতে তক্ষশিলায় আগমন করিত।

খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীর পুরোভাগে তক্ষশিলা প্রথম বিদেশীদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কারণ ডারাইস পার্শিপলিস্-এর শিলালিপিতে খকমলস-বংশীয় রাজা দরায়ুস সম্রাটের

সম্রাটের সমাধি গাত্রে লেখাগুলি হইতে জানা যায় যে, গান্ধার ও সিন্ধু রাজ্যের কয়েক অংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। হিরোডোটাস-এর বর্ণনামতে দারায়ুস খৃঃ পূঃ ৫১০ অব্দে গান্ধারের সীমান্তে উপস্থিত হন। সেই অভিযানে তিনি গান্ধার এবং সিন্ধু নদের উভয় কূলবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সাম্রাজ্য সিন্ধু সঙ্গম হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

শিরকাপ নগরে দুই ঈগল পক্ষীর মাথাযুক্ত যে মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গাত্রে একটি শ্বেত প্রস্তরফলক প্রোথিত ছিল। সেই ফলক খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় অব্দে আর্ম্মিক অক্ষরে উৎকীর্ণ। এই ফলক প্রমাণ করে যে, সে যুগে তক্ষশিলায় পারস্য প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। আর্ম্মিক অক্ষর হইতে খরোষ্টী অক্ষরের উৎপত্তি। সেই পারস্য সভ্যতার প্রভাব যে কত দিন ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে বুদ্ধের সময় এবং আলেকজেণ্ডারের ভারত-আক্রমণ সময়ে তক্ষশিলা স্বাধীন, ও হিন্দু রাজাদের শাসনে ছিল।

বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন তক্ষশিলার রাজা প্রক্কসতি মগধের রাজা বিম্বিসারের সম-সাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন।

বুদ্ধের সময় তক্ষশিলায় তাঁহার ধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। যদিও কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়।

খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে আলেকজেণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তখন তক্ষশিলা স্বাধীন ভারতীয় রাজা আম্ভির দ্বারা শাসিত হইতেছিল। তৎকালে তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং পূর্ব্বে বিতস্তা (ঝিলাম) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আম্ভি তখন প্রতিবেশী হিন্দু রাজা পুরুর ও অভিসার রাজ্যের রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এই প্রতিবেশী রাজ্যদ্বয়-এর বিনাশ সাধনের জন্য আলেকজেণ্ডারকে ভারত আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। আলেকজেণ্ডার তক্ষশিলা আক্রমণ করিলে, আম্ভি বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। আলেকজেণ্ডারকে আম্ভি তাঁহার প্রাসাদে কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া নানাভাবে তোষণ করেন। পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আম্ভি গ্রীক্‌সৈন্যগণের জন্য প্রচুর রসদ ও হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন। আলেকজেণ্ডার আম্ভির আতিথ্যে ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন এবং স্বাধীনভাবে শাসন করিবার অধিকার দিতে স্বীকার করেন।

তক্ষশিলা তখন একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, ঈর্ষা ও পররাজ্য-গ্রাস-লালসা আম্ভিকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল। প্রতিবেশী স্বজাতি গৃহশত্রুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহিঃশত্রুকে ডাকিয়া আনেন। আলেকজেণ্ডার যখন উদ্‌খণ্ডের নিকট উপস্থিত হন, তখন আম্ভি দূত পাঠাইয়া আলেকজেণ্ডারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন।

স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া আম্ভি আলেকজেণ্ডারকে অভ্যর্থনা করিয়া ভারতে আনয়ন করেন। তাঁহারই দুর্বুদ্ধিতে বিদেশী রাজা ভারতে প্রবেশ করে। এইরূপে যুগে যুগে ভারতবাসী নিজ জন বা প্রতিবেশীকে জব্দ করিবার জন্য বিদেশীদের ভারত-আগমনে সাহায্য করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল দেশ-মাতাকে পরাইয়া আসিতেছে।

আলেকজেণ্ডার তক্ষশিলা অধিকার করিবার পর তিনি পুরুর রাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁহার বিজয়-অভিযান যমুনার তীর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। পরে পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া আলেকজেণ্ডার পুরুকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন। শুধু তাহা নয়, তিনি গৃহশত্রু তক্ষশিলার রাজা আম্ভির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেন। এমন কি পরস্পরকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করাইয়া দেন। আলেকজেণ্ডার আরও উদারতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা অধিকৃত কয়েকটী রাজ্য তক্ষশিলার সহিত সংযুক্ত করিয়া আম্ভিকে প্রদান করেন।

আলেকজেণ্ডারের সহিত যে সব রাজদূত বা ঐতিহাসিকগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ হইতে তক্ষশিলার ঐশ্বর্য্যের কথা জানিতে পারা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন—তক্ষশিলা তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ এবং সুশাসিত নগর ছিল। রাজ্যের আয়তন সিন্ধু নদ হইতে বিতস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে

আর একজন ঐতিহাসিক ছিলেন, তাঁহার নাম এরিষ্টোবুলাস, তিনি লিখিয়াছেন—এই সময় তক্ষশিলায় অনেক দার্শনিক পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার আর একজন সঙ্গী অনেসিক্রিটোস দুইজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বিবরণ দিয়াছেন।

আলেকজেণ্ডারের ভারত-বিজয় অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়। রাজ্যের অন্যাংশে গোলযোগ হওয়ায় তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করিতে হয়। তিনি বিজয়লব্ধ রাজ্য কায়েমী করিবার জন্য সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া ম্যাসিডোনিয়ার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্যের সেনাপতিদের মধ্যে ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত হয়। আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে, খৃঃ পূর্ব্ব ৩২১ অব্দে বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। এই সময় তক্ষশিলার রাজা আম্ভি নির্ভয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকেন। গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাস পশ্চিম এসিয়া ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য লাভ করেন এবং উইডিমস সিন্ধু উপত্যকার রাজ্যখণ্ড প্রাপ্ত হন।

তৎপর খৃঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে উইডিমস্ এন্টিওকাসের বিরুদ্ধে ইউমিনসকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলসহ সিন্ধু উপত্যকা ত্যাগ করিয়া যান। এই অবসরে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত অতুল শৌর্য্য-বীর্য্যের সহিত সীন্ধুনদের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী সমুদয় গ্রীক রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সেই সময়েই

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশ ও তক্ষশিলা অধিকার করেন। তাহার কয়েক বৎসর পরেই খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সেলিউকাস বিরাট সৈন্য লইয়া হৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবার মানসে সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলা অভিমুখে অভিযান করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রবল বিক্রমের সহিত সেলিউকাসের সমর-অভিযানের গতি-রোধ করেন। সেলিউকাস পরাজিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্বে-আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান নিজ অধিকারে পান। সেই সময় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্ গ্রীক রাজদূত রূপে অবস্থান করিতেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে আছে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে পাটলিপুত্র হইয়া ত্যাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত রাজপথ ছিল। এই রাজপথ বিতস্তা, শতদ্রু, যমুনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়া হস্তিনাপুর, প্রয়াগ, বারাণসী পাটলিপুত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, এই রাজপথের ধ্বংস রেখা অবলম্বন করিয়া শেরসাহ পেশোয়ার হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোন কোন প্রদেশে বিদ্রোহ হয়। বিন্দুসারের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৯৮—২৭৩) তক্ষশিলাতে বিদ্রোহ-দমনের জন্য কুমার

অশোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অশোককে দেখিয়া তক্ষশিলা-বাসীরা জানায় যে তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে তাহাদের যত আপত্তি। খৃঃ পুর্ব্ব ২৭০ অব্দে অশোক মগধের সিংহসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে স্বতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদসহ তাঁহার পুত্র-গণের মধ্যে একজন যুবরাজ কার্য্যভার পাইয়াছিল। দিব্যাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিদ্রোহ-দমনের জন্য অশোক তাঁহার প্রিয় পুত্র কুণালকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাবংশ গ্রন্থের মতে অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কাশ্মীর ও গান্ধার রজ্যে স্থবির মউদগলী পুত্র তিষ্য কর্ত্তৃক বৌধ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল, এবং প্রচারকগণের দ্বারা তথায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে তক্ষশিলা শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে মহীয়ান ও গরীয়ান হইয়া উঠে। বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ হয়। কিম্বদন্তী অনুসারে তক্ষশিলায় মহারাজ অশোক 'ধর্মরাজিকা', 'কুণাল' ও 'মস্তক প্রদান' স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৩১ অব্দে রাজচক্রবর্ত্তী মৌর্য্যসম্রাট অশোক ইহ-লোক ত্যাগ করেন। তখন তক্ষশিলায় মৌর্য রাজ্যের প্রাধান্যের অবসান হয়, তক্ষশিলাবাসিগন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে বহ্লীক রাজা এন্টিয়কাসের জামাতা ডেমিট্রিয়াস্ সর্ব্বপ্রথম তক্ষশিলা দখল করেন। পরে তৎপুত্র

প্যাটালিয়ন এবং এগোথক্লেশ যথাক্রমে তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ১৭৫ অব্দে অন্য এক গ্রীক সেনাপতি ইউক্রেটাইডেস ডেমিট্রিয়াস-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য দখল করিয়া তক্ষশিলা করতলগত করিয়াছিলেন।

তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৬০ অব্দে গ্রীক বীর মেনান্দর (রাজা মিলিন্দ) তক্ষশিলা দখল করেন। কথিত আছে মেনান্দর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধস্তূপ ও সঙ্ঘারাম গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পর এপোনটেডাস তক্ষশিলার রাজা হন।

খৃঃ পূঃ ১৪৫ অব্দে এণ্টিয়ালসিডাস নামে এক গ্রীক, তক্ষশিলার রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে শিরকাপ নগরের ঐশ্বর্য্য উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার এক বিশিষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল তক্ষশিলা। তাহার বহু প্রমাণ মূদ্রায়, শিল্পে ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। তক্ষশিলা ও পাঞ্জাবের গ্রীক রাজাদের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। এক শতাব্দীর কিছু পরেই তক্ষশিলায় ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজ্য বিনষ্ট হয়।

তখন মধ্য-এশিয়াতে পারদ (পার্থীয়) ও শক (শিথীয়) নামক দুই জাতি প্রবল হয়।

পার্থিয়ার গ্রীক রাজা মিথ্রিডেটস খৃঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে বিপুল সৈন্য লইয়া ভারত আক্রমণ করেন এবং তক্ষশিলা দখল করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার বিজয়-অভিযান ক্ষণস্থায়ী

হয়। ইহার পর শকগণ সিস্থান হইতে আরকোশিয়া অর্থাৎ কান্দাহারে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসবাস করেন। তখন ভারতের সীমা কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহাদের মধ্যে একদল শক মাউয়েস-এর নেতৃত্বে সিন্ধুনদ পার হইয়া তক্ষশিলা দখল করেন। খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে ১ম এজেস্ তক্ষশিলার মাউয়েসের স্থানে রাজা হন। এই এজেস্ বংশ পার্থীয় ভনোনেসের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় "পারদ ও শক" এক মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হয়। তাঁহার সময় শক রাজ্য যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনিই রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাজপ্রতিনিধি এবং ক্ষত্রপ্ নামীয় প্রাচীন পারসিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলাতে রাজা স্বয়ং বাস করিতেন। তাহার পর খৃঃ পূঃ ১৫ অব্দে এজিলাইসেস্, খৃঃ পূঃ ১০ অব্দে পান্তিক এবং খৃঃ পূঃ ৫ অব্দে ২য় এজেস্ তক্ষশিলায় রাজা হন এবং ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করেন।

২য় এজেসের মৃত্যুর পর ২০ হইতে ৩০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পার্থীয় রাজা গোণ্ডোফারেস্ কান্দাহার ও তক্ষশিলা এক রাজ্যভুক্ত করিয়া তক্ষশিলাকে রাজধানীরূপে ব্যবহার করেন। পরে তিনি কাবুল প্রদেশকেও নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার সময় তক্ষশিলার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হয়। নব প্রবর্ত্তিত খৃষ্ট-ধর্মে একজন প্রচারক সাধু সেণ্ট টমাস

তক্ষশিলায় আগমন করিয়া গোণ্ডোফারেসের রাজসভায় অবস্থান করেন।

গোণ্ডোফারেসের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি গ্রীস রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে ব্যবসায়িগণ তক্ষশিলয়ে বাণিজ্যের জন্য আসিত, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ হইতে পণ্য আমদানী-রপ্তানী করিত। প্রকৃতপক্ষে ইনিই তক্ষশিলায় পারদ (পার্থীয়) সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও শিল্প-সম্ভার তাহার প্রমাণ দেয়। মার্শাল সাহেব বলেন—

"তবে তক্ষশিলায় যে নব পার্থীয় সভ্যতার বিকাশ হয় তাহা আর্য্য-সভ্যতারই স্বরূপ ; ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন পার্থীয় সভ্যতা হইতে ভিন্ন রূপ।"

গোণ্ডোফারেসের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যদিও সে যুগে আরো কিছুদিন তক্ষশিলা পার্থীয়দের অধীন ছিল। এই সময়ের রাজাদের মধ্যে 'সাসন' ও 'সাপাডেনেস্' নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা তক্ষশিলায় অবিষ্কৃত হইয়াছে।

পার্থীয়গণের রাজত্বকালেই তিয়ান নগরের প্রসিদ্ধ দার্শনিক এ্যাপলনিয়াস তক্ষশিলায় ৪৪ খৃষ্টাব্দে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী-লেখক ফিলোষ্ট্রাটাস লিখিয়াছেন যে—এই সময় পরাক্রমশালী নরপতি ফ্রাটোস্ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। এ্যাপোলনিয়াস্ উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া তক্ষশিলায়

প্রবেশ করেন। প্রবেশের পূর্ব্বে শিরকাপ নগরের উত্তর-তোরণের সন্নিকটে এক মন্দিরে নগর-প্রবেশের জন্য রাজার আদেশের অপেক্ষায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহাই ঝাণ্ডিয়ালের বিখ্যাত মন্দির।

তিনি বলেন—তক্ষশিলা নগরী আয়তনে বাবেরুর বিখ্যাত "নিনিভা" নগরের সমান। গ্রীক্ নগরগুলির ন্যায় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। রাস্তাগুলির এথেনস সহরের ন্যায় সংকীর্ণ কিন্তু সোজা, বাটীগুলি সব বাহির হইতে একতলার মতন দেখায়, কিন্তু প্রায় সকল গৃহের নিম্ন-তলে মৃত্তিকার মধ্যে "তাওয়াই খানা" বা ঠাণ্ডিঘর আছে। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি সূর্য্য-উপাসনার মন্দির এবং রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ।প্রাসাদটি সাদাসিদা।

স্যার জন মার্শাল লিখিয়াছেন অনেকে এই বিবরণ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁহার দ্বারা আবিস্কৃত অনেক উপাদান ফিলিওট্রেটাসের বিবরণ এবং এ্যাপোলিনিয়াসের তক্ষশিলায় আগমন সমর্থন করে।

"মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি
ভূষিত হল ধরা স্বরগ সুষমায়।
করুণা সিন্ধু হে! ভুবন ইন্দু হে
ভিখারী জগময়ী! প্রণতি তব পায়॥"

—সত্যেন্দ্র দত্ত

কুশানদের আগমন

পারদ জাতির (পার্থীয়দের) পর তক্ষশিলা কুশান জাতির অধীনে আসে। চৈনিক ঐতিহাসিকদের মতে কুশান জাতি উত্তর-পশ্চিম চীনের "ইউ-চী" জাতির সমগোত্র। খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দে ইহারা উত্তর-পূর্ব্ব চীন হইতে বহির্গত হইয়া বহ্লীক (ব্যাকট্রিয়া) প্রদেশে ও অকসাস্ উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে কাবুল রাজ্য অধিকার করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

কুজূলা কদফিস্স ৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাইৎ পার্থীয়দের নিকট হইতে তক্ষশিলা জয় করেন। অনুমান ৭৮ খৃষ্টাব্দে কুজূলা কদফিসসের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ভীম কদফিস্স তক্ষশিলার রাজা হন এবং ইঁহারই রাজত্বকালে তক্ষশিলার রাজ্যসীমা বিস্তৃতি লাভ করে। ৭৮ খৃষ্টাব্দেই প্রসিদ্ধ "শকাব্দ" প্রচলিত হয়। স্যার জন মার্শাল তক্ষশিলার আবিস্কৃত নানা মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে কদফিস্সের সময় ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছে স্থির করিয়াছেন। ভিন্-সেন্ট্ স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাহাই স্বীকার করিতেছেন। ভীম কদফিসস্এর মৃত্যুর পর ১০০-১১০ খৃঃ অব্দ মধ্যে 'সোটের মেগস' (মহানত্রাণ কর্ত্তা) উপাধিধারী

এক শক্তিশালী ব্যক্তি তক্ষশিলার রাজা হন। "সোটের মেগস্ নাম" অঙ্কিত কয়েক খানি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

১২০-১২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত সম্রাট কণিষ্ক তক্ষশিলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়া হইতে মগধ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

কণিষ্ক তক্ষশিলার শিরসুখ নগরটি অতি মনোরম ও সুদৃশ্য করিয়া গঠন করিয়াছিলেন। বহু সৌধ, তোরণ, প্রাসাদ, স্তূপ, মঠ, সঙ্ঘারাম, মন্দির বিশিষ্ট নূতন শিল্প ও স্থাপত্য-ধারায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে তক্ষশিলার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মালম্বী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও শিল্পের উন্নতি ও প্রসার অধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু, শিল্পী ও পণ্ডিতগণ সমস্ত মধ্য-এশিয়া ও চীন-সাম্রাজ্যে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, শিল্প ও স্থাপত্যসৃষ্টি ও দার্শনিক-জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সকলের প্রভাবে এখনও চীন-জাপান প্রভাবান্বিত।

কণিষ্ক তাঁহার শীতকালীন রাজধানীর জন্য সুরম্য পুরুষপুর (পেশওয়ার) নগরের পত্তন করেন। তিনি পুরুষপুরে বুদ্ধের অস্থি স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেইটি এমনই সুন্দর যে, দেশ-বিদেশ হইতে বহু বক্তি স্তূপটি দেখিবার জন্য আগমন করিতেন। তক্ষশিলার

গৌরব তাঁহার সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কণিষ্ক চল্লিশ বৎসর প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করেন।

কণিষ্ক তক্ষশিলায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণের ৩য় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মহাসংহতি আহ্বান করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ 'মহাযান পন্থা' প্রধান্য লাভ করিতে থাকে। বৌদ্ধাচার্য্য কবি অশ্বঘোষ ও স্থবির বসুমিত্র কণিষ্কের সমসাময়িক। তাঁহারা মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কণিষ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হবিষ্ক ১৭০ খৃষ্টাব্দে তক্ষশিলার রাজা হন এবং পিতার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে।

হবিষ্কের মৃত্যুরপর ১৮৭ খৃষ্টাব্দে বাসুদেব তক্ষশিলায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং অনুমান ২২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সময়েও তক্ষশিলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও কুশানদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

৪০০ খৃঃ শতাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তক্ষশিলায় আগমন করেন। তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট। ফা-হিয়ান তক্ষশিলার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ভ্রমন-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন —তক্ষশিলা সুখ-সম্পদে পূর্ণ ছিল। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। দেশ ব্যাপিয়া চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল। স্তূপ ও সঙ্ঘরামের শিল্প-ঐশ্বর্য্য, স্থাপত্য-কৌশল,

ভিক্ষুদের ধর্ম্মানুরাগ, ত্যাগ এবং অহিংসা-ব্রত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

৪৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্বেতকায় হুন গান্ধার প্রদেশ হইতে এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে মশাল লইয়া তক্ষশিলায় প্রবেশ করে। ইহারা অতি নৃশংস ও রক্তলোলুপ জাতি। তক্ষশিলায় বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণকে বর্ব্বর ভাবে হত্যা করে এবং যাবতীয় স্তূপ, মঠ, বিহার ও সৌধে অগ্নি সংযোগ করিয়া ধ্বংস করে। ইহাদের একজন প্রধান নেতা তোরামানা। তাহার দ্বারা তক্ষশিলার সকল সম্পদ লুণ্ঠিত এবং সকল শিল্প-ঐশ্বর্য্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে তক্ষশিলার পূর্ণ অধঃপতন ঘটে।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তক্ষশিলায় আসিয়া তাহার সভ্যতার ও শিল্প-ঐশ্বর্য্যের মাত্র কঙ্কালসার দর্শন করেন। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশিষ্টের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু পূর্ব্ব-গৌরবের নিদর্শন পাইয়াছিলেন। তক্ষশিলার অতীত গৌরব-কাহিনী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, তক্ষশিলা তখন কাশ্মীর-রাজ্যভুক্ত একটি ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র। এই অঞ্চলের সামন্ত নৃপতিগণ পরস্পর কলহে ব্যাপৃত; অধিকাংশ মঠ ও বিহার হয় পরিত্যক্ত না হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

তাহার পর তক্ষশিলার ঐশ্বর্য্য সহস্র বৎসরাধিকাল

মৃত্তিকাগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম তক্ষশিলার বক্ষে প্রথম কোদাল চালনা করিয়া তাহার অতীত গৌরবের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৪—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খনন-কার্য্যের ফলে তক্ষশিলার অতীত গৌরবের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশেষে স্যার জন মার্শাল অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য, গভীর ধীশক্তি প্রয়োগ করিয়া তক্ষশিলার স্বরূপ ও অতীত গৌরবের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া তক্ষশিলার শিল্প, স্থাপত্য ও সভ্যতা এক সহস্র বৎসর বিশ্ববাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার বিবরণ অবগত হইতে হইলে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কাল নির্ণয়ের সুবিধার নিমিত্ত একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল (স্যার জন মার্শেলের 'গাইড টু ট্যাকশিলা' গ্রন্থ অবলম্বনে)—

বুদ্ধদেবের জন্ম	৫৬৪ খৃঃ পূঃ
পারস্য সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা খকমনস এর রাজত্বকাল	৫৫৮-৫৯ ,,
মহাবীরের তিরোধান	৫২৭ ,,
পারস্যরাজ দারায়ুসের রাজত্বকাল	৫২২-৪৮৬ ,,
তক্ষশিলা প্রথম পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়	৫১৮ ,,
পারস্যরাজ ক্ষয়ার্ষ রাজা হন	৪৮৬ ,,

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ	৪৮৩ খৃঃ পূঃ	
আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক তক্ষশিলা দখল ও রাজা অম্ভিরের বশ্যতা স্বীকার করা। বিতস্তাতীরে আলেকজেণ্ডারের নিকট পুরুর পরাজয়	৩২৬	”
আলেকজেণ্ডারের মৃত্যু	৩২৩	”
আম্ভির তক্ষশিলা রাজ্য পুনরাধিকার এবং পাঞ্জাব প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন	৩২১	”
গ্রীকরাজ ইউডামীউসএর সিন্ধু উপত্যকা ত্যাগ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের দ্বারা পাঞ্জাব দখল	৩১৭	”
সেলিউকসের ভারত আক্রমণ ও চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজয়	৩০৫-০৩	”
চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের আগমন	৩০০	”
বিন্দুসারের মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ	২৯৮	”
(তাঁহার সময়ে অশোক তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা হন)		
অশোকের রাজ্যাভিষেক	২৭৪	”
বহ্লীক ও পারদ জাতি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়	২৫০	”
সম্রাট অশোকের মৃত্যু	২৩২	”
ব্যাকট্রিয়ার রাজা ডেমিট্রিয়াসের পাঞ্জাব দখল	১৯০	”
ইউক্রাডিসএর তক্ষশিলায় আগমন ও শিরকাপ নগরের পত্তন	১৭৫	”
এণ্টিয়াসিলিডাস তক্ষশিলা দখল করেন	১৩০	”

তাঁহারই রাজত্বকালে গ্রীক রাজপুত্র হিলিওডোরাস মালোয়া রাজ্যে বিদিসা নগরে রাজদূত রূপে গমন, তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও গড়ুর স্তম্ভ স্থাপন।—খৃঃ পূঃ ১৪২

ভিলসায় হিলিওডোরাস স্থাপিত গরুড় স্তম্ভ। গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি।

আৰ্কিবিয়াসের রাজত্বের পর শকরাজ মাউজ তক্ষশিলা জয় করেন।	৮৫-৮০ খৃঃ পূঃ
বিক্রম সম্বৎ প্রচলন।	৫৮ ,,
এই সময় এজেস্ প্রথম তক্ষশিলায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এবং তাহার পর আজিলিয়াস্ ও ২য় এজেস রাজা হন।	৫৮ ,,
এ্যাক্রোসিয়া ও তক্ষশিলা রাজ্য পারদরাজ গোণ্ডোফোরাসের অধীনে মিলিত হইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।	২০-৩০ খৃষ্টাব্দ
গোণ্ডোফোরাসের কাবুল-রাজ্য দখল।	৩৫ ,,
গোণ্ডোফোরাসের রাজসভায় সাধু সেণ্ট টমাসের আগমন।	৪০ ,,
এ্যপোলোনিয়াসের তক্ষশিলায় আগমন।	৪৪ ,,
গোণ্ডোফোরাসের মৃত্যু ও রাজ্য বিভক্ত।	৫০-৬০ ,,
কুষাণ বীর ভীম কদফিসেস্ কর্ত্তৃক কাবুল, গান্ধার ও তক্ষশিলা জয়।	৬০-৬৫ ,,
শকাব্দ প্রচলন।	৭৮ ,,
(কোন কোন পণ্ডিতের মতে শকাব্দ ভিম দ্বারা প্রচলিত, কাহারও মতে কণিষ্ক শকাব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন)	
তক্ষশিলায় সোটার মেগস রাজা হন।	১০০ ,,

কণিষ্ক তক্ষশিলার রাজা হন এবং শিরসুখ নগর পত্তন করেন।	১২৫ খৃষ্টাব্দ
হবিষ্ক তক্ষশিলার রাজা হন।	১৭০ ,,
বাসুদেবের রাজ্যভার গ্রহণ।	১৮৭ ,,
বাসুদেবের মৃত্যু ও কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন।	২২৫ ,,
গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্ত ১ম, রাজা হন এবং গুপ্ত সম্বৎ প্রচলন করেন।	৩১৫ ,,
তক্ষশিলায় ফা-হিয়ান আগমন করেন।	৪০০ ,,
হুন জাতি কর্তৃক তক্ষশিলার ধ্বংস সাধন।	৪৫০-৫০০ ,,
হুন রাজ তোরামানের মৃত্যু ও মিহিরকুলের রাজ্যলাভ।	৫১০ ,,
চৈনিক পরিব্রাজক সুঙ্গ ইউনের গান্ধার ভ্রমণ।	৫২০ ,,
হিউয়েন সাংএর ভারত-ভ্রমণ।	৬২৯-৪৫ ,,

শিল্প-ঐশ্বর্য্য

খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতক হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত হাজার বৎসর হিন্দু, পারস্য, মৌর্য্য, বহ্লীক, শক, পারদ, ও কুষাণ-সভ্যতা তক্ষশিলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সকল জাতিই স্ব-স্ব ধারায় শিল্প সৃষ্টি করিয়া তক্ষশিলাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য পারস্য-শিল্প-ধারার কোন নিদর্শন তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। শিরকাপ নগরের এক মন্দিরের পুরোহিতের ভবনে আট-পলে শ্বেতপাথরের

এক স্তম্ভের গাত্রে "আরামাইক" অক্ষরে খোদিত শিলা-লিপির অংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মান পণ্ডিত ডাঃ হার্টস্‌ফেল্ড শিলালিপিতে "প্রিয়দর্শী" শব্দ উৎকীর্ণ দেখিয়া অনুমান করেন এই গৃহ মৌর্য্য যুগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক বহ্লীক প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর ইরাণী ও গ্রীক (হেলেনেষ্টীক) শিল্প-ধারার সংযোগে এক নূতন শিল্প-ধারার সৃষ্টি হয়। মৌর্য্য ও ব্যাক-ট্রিয়ান গ্রীকদের মধ্যে সদ্ভাবের ফলে সেই নব শিল্পধারা ও স্থাপত্য তক্ষশিলা-গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।

বীরমণ্ডল নগরে আবিষ্কৃত শিল্প-সম্ভার দেখিলে মনে হয় গ্রীক শিল্প-ধারার কিছু কিছু প্রভাব বীরমণ্ডলের মৌর্য্য শিল্প-স্থাপত্যের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ যখন তক্ষশিলা দখল ও শিরকাপ নগরের পত্তন করেন তখন তাহাদের শিল্প-ধারা তক্ষশিলার শিল্প ও স্থাপত্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শিরকাপের ধ্বংসাবশিষ্টের মধ্যে সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নব-নির্ম্মিত নগরের রাস্তা ও গলিগুলি বীরমণ্ডলের রাস্তা অপেক্ষা অধিকতর সমান আকারের এবং সরল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ; কিন্তু মন্দির ও দেব-দেবীমূর্ত্তি গঠনের মধ্যে গ্রীক প্রভাব দেখা যায় না। আবার মুদ্রার উপর গ্রীক-শিল্প-ধারার ছাপ যথেষ্ট। মুদ্রাগুলি গ্রীক মুদ্রারই অনুকরণে নির্ম্মিত।

এথেন্স নগরে প্রচলিত মুদ্রার মতন সম ওজনে ও মানে তক্ষশিলার মুদ্রা প্রস্তুত হইত। মুদ্রাগুলির উপর অঙ্কিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি গ্রীকদেশের দেব-দেবীরই মতন।
স্যার জন মার্শাল বহু যুক্তি ও নমুনা সাহায্যে তক্ষশিলার বিভিন্ন রাজবংশের মুদ্রাগুলির বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে বহ্লীক গ্রীকগণ যখন তক্ষশিলায় স্থায়িভাবে বসবাস করেন তখন মুদ্রার উপর হইতে গ্রীক প্রভাব অন্তর্হিত হয়। ভারতের মধ্যে ও সমুদ্র-কূলবর্ত্তী দেশ সমূহের সহিত বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতীয় শিল্পধারায় মুদ্রা প্রস্তুত হইতে থাকে। সেই সব মুদ্রার উপর ভারতীয় অক্ষর ও মূর্ত্তি খোদিত হইতে দেখা যায়। সেইগুলি শিল্পীর স্বাধীন পরিকল্পনা ও সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। এই প্রকার বহু মুদ্রা তক্ষশিলার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের কয়েকটি কলিকাতার যাদুঘরে ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরেও আছে।

মার্শাল সাহেব তাঁহার 'গাইড টু ট্যাকশিলা' পুস্তকে গ্রীক, শক, কুষাণ নরপতিদের ও প্রাচীন হিন্দু ও হুন রাজাদের ২৩টি মুদ্রার প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়াছেন। সেই সব রাজাদের নাম—সোফিটেস, ডিওডোটাস, ইউথিডিমস, ডেমিট্রিয়াস, আলেকজেণ্ডার, ইউক্রাটিডেস, মেনান্দার, হারমাইউস, এজেস ১ম, গোণ্ডোফোরাস, কাদফিসেস, ২য় মেগাস, কণিষ্ক, রাজুভুলা, বাসুদেব।

কেবল যে মুদ্রাতে সে যুগের শিল্পধারা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে; অলঙ্কার, পোড়া মাটীর (টেরাকোটার) কাজ, ও মৃৎ-পাত্রগুলিও প্রাচীন শিল্পধারার পরিচয় দেয়। দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে গ্রীক্ ও ভারতীয় দেব-দেবীর সাদৃশ্য ও সমশক্তি উপলব্ধি হয়। ভারতের সূর্য্যদেব গ্রীকদের দেবতা এ্যাপোলো, ভারতের মদন গ্রীক্‌দের এরোন-এর তুল্য মনে হয়। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক্‌গণ হিন্দুর শিব, পার্ব্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতি—দেব-দেবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তক্ষশিলার গ্রীক রাজদূত হিলিয়োডোরাস বিদিসায় রাজার কুলদেবতার ভক্ত হইয়া সেখানে একটি গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করেন।

ভারত ও পার্থীয় শিল্পিগণের সমবেত চেষ্টায় "ইণ্ডো-পার্থীয়" নামে এক নূতন শিল্পধারার সৃষ্টি হয়। পার্থীয়গণ সুসভ্য; তাঁহারা ভূমধ্যসাগর, আরব ও পারস্য দেশে বাণিজ্য করিতেন। সেখানে নানা জাতির সংস্পর্শে তাঁহাদের শিল্প-সৃষ্টি-শক্তি উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিরকাপ নগরের শিল্প-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সেই নূতন শিল্পধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় তিন শত বৎসর তক্ষশিলার শিল্প হেলেনিক্ শিল্প-পদ্ধতির প্রভাবে গড়িয়া উঠে। তাহার পর গান্ধার শিল্পধারা তক্ষশিলার শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মার্শাল সাহেব বলেন—"তক্ষশিলায় গান্ধার শিল্পের বহু

নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গান্ধার শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাসের সহিত তক্ষশিলার কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধার শিল্প উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তের বাহিরে সৃষ্টি হইত, শক্ত মসৃণ পাথর ছিল তাহাদের উপাদান। ইহা সত্য যে কুষাণ নৃপতি কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার-শিল্প চরম বিকাশ লাভ করে। যদিও কাবুল প্রদেশেই গান্ধার শিল্পের উৎপাদন অতি অধিক হইয়াছিল।"

আফগানিস্থান তখন ভারতের এক অংশ ছিল। ১৯৪৬ সালে এসিয়াটিক সোসাইটীর ভবনে কাবুল সরকার হইতে যে সব শিল্পসম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি। তাহাদের গঠনের উপর গান্ধার ও হেলেনিক্ প্রভাব দেখা যায়।

স্যার জন মার্শাল আরো লিখিয়াছেন—"গান্ধার বা ভারতীয় শিল্প ও রোমের শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন উত্তর-ভারতের শিল্পের উপর রোমের শিল্পধারার প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল, তাহা ভুল হইবে। সেলুসিডাসের সময় হইতে পশ্চিম-এশিয়াই পৃথিবীর প্রাচীন শিল্পের উৎস। সেই উৎস হইতেই গ্রীক, আইওনিয়ান, পারস্য ও মেসো-পোটমিয়ার শিল্পধারার উৎপত্তি। এইস্থান হইতে শিল্পের মন্দাকিনীধারা পশ্চিমে সুদূর রোমরাজ্যে এবং বহ্লীক, পার্থীয়া, তুর্কীস্থান ও উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয়। রোমের শিল্পাদর্শ ভারতের শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই, বরং

বৈপরীত্যেরই পরিচয় দেয়। হেলেনিক্ শিল্পের সহিত গান্ধার-শিল্পের যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই রোম-শিল্পের সহিতও বর্ত্তমান। গান্ধার শিল্প রোম শিল্পের জ্ঞাতি-ভগ্নি স্বরূপ মাত্র, কন্যা নহে। দুইটী শিল্পধারা একই উৎস হইতে প্রবাহিত। সেই জন্য রোমের ও গান্ধার-শিল্পর মধ্যে সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নহে।" পৃঃ—৩৩

খৃষ্টীয় ৪ শতকে ও তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে তক্ষশিলায় ও আফগানিস্থান অঞ্চলে যে এক মনোরম শক্তিশালী নব শিল্পধারা জাগে তাহা ভারতের নিজস্ব। সেগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সৃজিত। ইহার উপর গান্ধার ও গ্রীক শিল্পধারার প্রভাব কিছু ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ ও জুঁলোয়ার বিহার হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইগুলি অধিকাংশই চূণ-বালির পলস্তারে ও পোড়া মাটীর দ্বারা নির্ম্মিত।

এই শিল্প সম্বন্ধে মার্শাল সাহেব লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীক শিল্পীগণের ধারণা, মানবের সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধিই শিল্পের আদর্শ ও উৎস। সে আদর্শ ভারতের শিল্পীগণের চিত্তে কোন চেতনা দেয় না। ভারতের চিন্তা ও আদর্শ মরজগৎ অপেক্ষা অমর জগতে নিবদ্ধ, সীমা অপেক্ষা অসীমের দিকে ধাবিত। যেখানে গ্রীকদের চিন্তা নীতির ভিত্তিতে প্রবাহিত, সেখানে ভারতের চিন্তা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় শিল্পীগণ গভীর

অধ্যাত্মিক প্রেরণা-বলে শিল্পের মধ্য দিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মভাব মূর্ত্ত করিতে এবং প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ বিকাশ করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য গুপ্তযুগের শিল্পীগণ প্রস্তর মূর্ত্তিতে এক অপূর্ব্ব অপার্থিয় চেতনা প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হইয়াছিলেন।”—পৃঃ ৩৫

মধ্যযুগের পূর্ব্বে ভারতবাসীরাও ভাবিতে পারে নাই যে তাহাদের শিল্পীগণের কল্পনা, চিন্তা ও আদর্শ জড়ের মধ্যেও এমন পরম তত্ত্ব ও সত্য ফুটাইতে সক্ষম হইবে। তাহারাও মনে করিত যে শিল্প ইন্দ্রিয়-ভোগ্য; সৌন্দর্য্য-বিকাশের আধার, মানবের সুখ ও রসভোগের অবলম্বন, সুকুমার বৃত্তির অবচেতনার উৎস। কিন্তু বৌদ্ধ ও গুপ্তযুগের শিল্পীগণ শিল্পকে ভগবৎ-অনুরাগ-প্রকাশের, আধ্যাতিক জ্ঞান-বিকাশের, ধর্ম্ম ও নীতি-প্রচারের বাহন মনে করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহাদের সাধনা ও সৃষ্টি জগতে অমর ও চির-আদরণীয়।

তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত শিল্প-সম্ভার তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তক্ষশিলার সরকারী যাদুঘরে স্তূপ, নগর, সঙ্ঘারাম, বিহার খনন করিয়া বহু শিল্প-ঐশ্বর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। পরিতাপের বিষয় ভারত খণ্ডিত হইবার পর তাহা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের নিকট অগম্য।

তক্ষশিলার সংগ্রহালয়

তক্ষশিলার যাদুঘর ১৯২৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। সৌধটি মনোরম, প্রতি কক্ষে ও দালানে প্রচুর আলো

প্রবেশ করে। এইস্থানে সজ্জিত শিল্পগুলি আড়াই হাজার বৎসরের আর্য্য সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। বৃটিশ রাজত্বের একটি প্রধান অবদান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। ভারতবাসী সেইসব প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের পথ-প্রদর্শক ফার্গুসন, ক্যানিংহাম, কিটো, মার্শাল এবং ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। শিল্প-সম্ভারগুলি যুগ ও গঠনধারা হিসাবে সুসজ্জিত আছে। যাদুঘরের সাজানর কৌশলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ছিল। ১৯৪৫ সালে যখন সপরিবারে সংগ্রহালয়টি দেখি, তখন সেখানে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (খনন-বিভাগ) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র ঘোষ (বর্ত্তমানে ডিরেক্টার জেনারেল) এবং তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত গুপ্ত ছিলেন। এইস্থানের শিল্প-সম্ভারগুলি স্বচক্ষে না দেখিলে কেবল বিবরণ-পাঠে তাহার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। এইস্থানে কয়েকটি নিদর্শনের নাম করা হইল :—

১। শিরকাপ নগরে প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ ১ শতকের সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত কানবালা ও মকর কুণ্ডল।

২। এই যুগের রূপার কারুকার্য্য-খচিত ট্রে (থালা) বাটী, ফুলদানী, ঘটি, পিকদানী।

৩। মোটা রূপার মল, সোনার স্বস্তিকা আকারের আংটী, নানা রত্নখচিত সোনার হাঁসুলী, অনন্ত, লম্বা গার্ডচেন হার।

৪। শিরকাপে আবিষ্কৃত গ্রীক্ শীলমোহর, যাহার উপর তুইটি শিশুমূর্ত্তি খোদিত (যন্ত্রর দ্বারা)।

৫। মোহাঁমোরাদুতে প্রাপ্ত প্রমাণ আকারের দণ্ডায়মান মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্ত্তি।

৬। পোড়ামাটীর প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তির শিরোভাগ।

৭। ৪—৫ খৃঃ শতকের সুন্দর ষ্টকো (পলস্তারের) বুদ্ধ মূর্ত্তির শিরোভাগ।

৮। খৃঃ পূঃ এক শতকের মিশর দেশীয় হারপোক্রটিশ-এর ব্রোঞ্জ ধাতুমূর্ত্তি।

৯। শিরকাপ হইতে প্রাপ্ত রূপার পাতের উপর অতি সুন্দর ডায়োনিসাস-এর মূর্ত্তির শিরোভাগ।

১০। খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ ৭৬ খৃষ্টাব্দের তাম্রলিপি।

১১। জি ৫ নং স্তূপে প্রাপ্ত ধাতু-কৌটার মধ্যে রৌপ্য লিপি।

১২। শিরকাপে প্রাপ্ত খৃঃ প্রথম শতকের রূপার চামচ।

১৩। সমকোণ রূপার থালা, ৪টি পায়ার উপর বসান। তাহার উপর খোরষ্ঠী অক্ষরে দাতার নাম।

১৪। রূপার ঝুড়ি—গোমানদের পুত্র জামদানবের দানপত্র।

১৫। নানা রত্ন-খচিত সোনার ২০টি আংটী, তাহাদের পার্শ্বে ও নিম্নে কাঁকড়া, বিছা, স্বস্তিকা চিহ্ন উৎকীর্ণ।

১৬। জৌলিয়াঁর ১১নং স্তূপে প্রাপ্ত ধাতু-কৌটা।

১৭। ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ হইতে প্রাপ্ত "অর্ঘস্তূপ"।

১৮। তিন-থাকবিশিষ্ট ধূসর-গ্রেনাইট প্রস্তরের ছত্র এবং শিরকাপ নগরে প্রাপ্ত পাথরের বেড়া।

১৯। ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের ধূসরবর্ণ পাথরের থামের মাতলা সুন্দর কোরিস্থিয়ান গঠনের নিদর্শন।

২০। জৌলিয়াঁর প্রস্তরের মনোরম বুদ্ধমূর্ত্তি।

২১। শিরকাপ সহরের নিম্নস্তরের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসন-বাণী-ফলকের অর্দ্ধাংশ।

২২। ৭´×৭´ চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর ৬´ উচ্চ পাথরের স্তূপ, তাহার চারিধারের কুলঙ্গীর মধ্যে ছোট ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি, গাত্রে অনেক ভিক্ষু, ভক্ত, জীবজন্তু ও গাছপালা খোদিত আছে।

২৩। মোহ্রামোরাদু হইতে প্রাপ্ত অতি মনোহর বুদ্ধমূর্ত্তি।

২৪। জৌলিয়াঁতে প্রাপ্ত চুনবালি-অস্তরে মণ্ডিত বুদ্ধমূর্ত্তির দুইফিট মাপের শিরোভাগ।

২৫। তামার বড় থালা, ভিক্ষাপাত্র, গামলা, আংটাযুক্ত যজ্ঞকুণ্ড-পাত্র।

২৬। ব্রোঞ্জের চোঙ্গা নল।

২৭। তামার লাগামসহ ঘোড়ার জীন।

২৮। লৌহরথের চক্র (তাহার কাঠিগুলি সব ঠিক আছে) শিরকাপ হইতে প্রাপ্ত খৃঃ প্রথম শতকে নির্ম্মিত।

২৯। কামার শালার লৌহের নেহাই।

৩০। ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ হইতে প্রাপ্ত চুন-বালির পলস্তারে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির ৩০″ শির।

৩১। শিরকাপে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ব্রোঞ্জের ষাঁড়।

৩২। তামার পাতের উপর হাতির দাঁতে তৈয়ারী কপোত আকৃতির হাতল সংযুক্ত ঢাক্না।

৩৩। ব্রোঞ্জের মুর্গির মতন পাখী।

৩৪। খৃঃ তৃতীয় শতকে তৈয়ার হাড়ের ও হাতির দাঁতের মাথার কাঁটা।

৩৫। ৫′ ফিট উঁচু লাল পোড়া মাটির জালা।

৩৬। কুষাণ যুগের শঙ্খবলয়।

৩৭। বৃহৎ লৌহথালা।

৩৮। তামার ও লৌহের ছোট-বড় ঘণ্টা।

৩৯। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের অস্ত্র ও লৌহদণ্ড।

৪০। লৌহের গাড়ী ও রথ। কাঠিযুক্ত এবং কারুকার্য্য-মণ্ডিত চক্র।

৪১। মোর্হামোরাদু হইতে প্রাপ্ত সুন্দর মনোরম নব-পরিকনল্পার ধূসর প্রস্তরের মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্ত্তি।

৪২। সাড়ে তিন হাত উচ্চ ধূসর পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি।

নগরত্রয়

বীরমণ্ডল

তক্ষশিলার বীরমণ্ডল, শিরকাপ ও শিরস্থুখ নগর তিনটীর মধ্যে বীরমণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ষ্টেসনের সংলগ্ন উচ্চ ভূমির উত্তর-পূর্ব্বাংশে বীরমণ্ডলের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই স্থানটি "বীরদরঘাই" নামে পরিচিত পল্লীর অংশ। সহরটী উত্তর-দক্ষিণে ১২১০ গজ লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭৩০ গজ চওড়া। পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমার নগর-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সে যুগের স্থাপত্য-কৌশল প্রতীয়মান হয়। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বের সীমানার কতক অংশ তাম্রনালার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। তাম্রনালার অপর তীরে পর্ব্বতের উপর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ অবস্থিত। পশ্চিম-উত্তরাংশে নূতন যাদুঘর।

পর পর চারবার এই স্থানে নগর নির্ম্মিত হওয়ায় ভূমি প্রায় ৬০।৭০ ফিট উঁচু হইয়া গিয়াছে। খনন করিয়া চারিটী বিভিন্ন স্তরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম স্তরের সৌধাবলীর ভিত ২ ফিট নিম্ন স্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই স্তরটীর গৃহাদির ধ্বংস হইতে অনুমান হয় এই নগর খৃঃ পূঃ তিন শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পরের স্তর আরো ৪ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্তরের স্থাপত্য-চিহ্ন হইতে মার্শাল সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে ইহা মৌর্য্যযুগের নগরের অবশিষ্ট অংশ। এই নগরেই মৌর্য্য

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোক-আদির বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

তাহার পর তৃতীয় স্তর আরো ৬ বা ৭ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এই স্তরের অট্টালিকার চিহ্ন হইতে এই নগর ৬০০ শত বর্ষ খৃঃ পূর্ব্ব যুগের বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইহারও ১২।১৪ ফিট নিম্নে নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় স্তরের মেঝের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাথরের জালা আংশিক ভাবে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরের প্রকোষ্ঠ গুলি একই ধরণের ক্ষুদ্রকায়। সর্ব্ব নিম্ন স্তরে পোড়ামাটীর উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী বাহির হইয়াছে। এই সকল স্তরে ১৩।১৪ ফিট গভীর এবং ২।৩ ফিট ব্যাসের বাঁধান কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কূপগুলি মল ও আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপ অনেক পণ্ডিত অনুমান করিয়া থাকেন।

এই নগরের সৌধগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় গঠিত হয় নাই। তবে সুদক্ষ শিল্পীর সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি বৃহৎ অট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পাঁচ ফিট উঁচু চারকোণা কয়েকটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগুলির ব্যবধান সমান, প্রত্যেকটির উপর বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত। রাজপথ ও গলি রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ, আঁকা-বাঁকা ও বিশৃঙ্খল।

এই নগরের খনন কার্য্যের সময়ে বহু প্রাচীন মুদ্রা, মাটীর বাসন, খেলনা, ছোট ছোট মাটির মূর্ত্তি, মূল্যবান পাথরের মালা, সোনার গহনা পাওয়া গিয়াছে। এইস্থানের উত্তর অংশে একটি বৃহৎ মাটির কলস মধ্যে ১৬০টি মুদ্রা, এ্যাণ্টিওকাসের নামাঙ্কিত সুন্দর একটি স্বর্ণমুদ্রা, কতকগুলি সোনার ও রূপার গহনা, বহু মুক্তা, বেগুনী ও লাল রংয়ের পাথর, প্রবাল, নানা প্রকার মূল্যবান রত্ন। আর একটি মাটীর ভাঁড়ের মধ্যে আলেকজেণ্ডারের মূর্ত্তি ও নামাঙ্কিত দুইটি মুদ্রা ও ফিলিপের একটি রৌপ্যমুদ্রা, নানা প্রকার অস্ত্র-চিহ্ন-অঙ্কিত প্রায় বারশত রূপার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশিলার নগরত্রয়ের যে অংশ 'জমিদারগণ' (চাষীরা) আবাদ করিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইবার সময় এখনও মুদ্রা পাওয়া যায়। এই নগরই আলেকজেণ্ডার দখল করেন এবং তক্ষশিলার রাজা আম্ভির অতিথিরূপে কয়েক সপ্তাহ এখানেই বাস করেন।

শিরকাপ

বীরমণ্ডল নগরের পশ্চিম-উত্তরে দ্বিতীয় নগর শিরকাপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতকে গ্রীক রাজাগণ বীরমণ্ডল নগর ত্যাগ করিয়া এই নূতন নগরের পত্তন করেন। সেই সময় হইতে ১০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভিম্ কদফিসের সময় পর্য্যন্ত ২৭৫ বৎসর তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী নগর, উৎকৃষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল।

সমস্ত নগরটি সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এখনও সেই নগর-প্রাচীরের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়। প্রাচীর ৩½ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ১৫ হইতে ২০ ফিট এবড়োখেবড়ো ছোট বড় পাথর দ্বারা কাদামাটির মসলা দিয়া নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে চারকোণা বুরুজদ্বারা সমর্থিত। পরবর্ত্তী কালে প্রাচীর-সংস্কার সময়ে বুরুজগুলি ঢালু করিয়া গাথুঁনির দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম নগর-তোরণের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। উত্তরের তোরণের দুই পার্শ্বে নগর-প্রাচীরের ভিতরদিকে কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরী অবস্থিত ছিল, সেইগুলি প্রহরিগণের থাকিবার পূর্ব্ব পার্শ্বে সে যুগের একটি কূপ এখনও রহিয়াছে।

শিরকাপ নগরের দক্ষিণাংশ হাতিয়াল পর্ব্বতের উপর বিস্তৃত। এইস্থানে কুণাল-স্তূপ ও একটি মঠ অবস্থিত। নগরের উত্তর অংশ সমতল উপত্যকায় প্রসারিত। উত্তর সীমানায় উত্তর তোরণ হইতে সমতল ভূমির উপর নগরের সে অংশ অবস্থিত ছিল তাহা খনন করিয়া পরিষ্কার আকারে একটী নগরের স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। উত্তর দ্বার হইতে সুপ্রশস্ত রাজপথ দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথের দুইপার্শ্বে বহু সৌধাবলি অবস্থিত। পূর্ব্বাংশে ঈগলপাখীর দুই মাথা যুক্ত মন্দির, স্তূপ, রাজপ্রাসাদ অবস্থিত আর পশ্চিম ধারে ঘন ঘন বসতিপূর্ণ বহু গৃহ ছিল। ১৩টী সরু গলি বড় রাস্তাটী হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে গিয়াছে।

তাহাদের দ্বারা নগরটি কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত হইয়াছে।

বড় রাস্তার পূর্ব্বে দ্বিতীয় মহল্লাতে একটি চার-কোণা স্তূপের চিহ্ন আছে। মধ্যে স্তূপ, তাহার প্রাঙ্গণের চারিদিকে ভিক্ষুদের থাকিবার ঘর। খননকালে এই স্তূপ হইতে একটী স্ফটীকের কৌটার টুকরা পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চম মহল্লায় এক বিশাল বৌদ্ধ চৈত্য ছিল, ইহা তিন অংশে বিভক্ত—প্রথমে দ্বার ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তারপর চারকোণা মণ্ডপ, তৎপশ্চাতে বৃত্তাকার মূল মন্দির বা স্তূপ। তাহা বেড় দিয়া প্রদক্ষিণ করিবার দালান। গর্ভ-মন্দিরটীর ভিতরের ব্যাস ত্রিশ ফিট এবং ইহার ভিত মাটির নিচে ২২ ফিট পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা হইতে মার্শাল সাহেব অনুমান করেন, মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ ছিল এবং সৌধাবলী খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখান হইতে কজ্জুল কাদফিস্ ও হারমিস্ নরপতিদ্বয়ের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

চৈত্যটীর দক্ষিণ ধারে আর একটি বৃহৎ সৌধের চিহ্ন রহিয়াছে। তাহার উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি স্তূপ ছিল, স্তূপটি ভিতসহ উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবত ভূমিকম্পের আলোড়নে। ইহার সম্মুখে রাস্তার ধারে সারি সারি কয়েকটি ঘর। সকল ঘরের দ্বার রাস্তার উপর। এই গুলি সব দোকানঘর। এখান হইতে ব্রোঞ্জের গ্রীক্ দেবতা হার্পক্রেটসের মূর্ত্তি, রৌপ্য নির্ম্মিত ডাইওনিসাসের

আবক্ষ মূর্ত্তি, রূপার চামচ, দুই জোড়া সোনার বালা, পাঁচটি সোনার কুণ্ডল, তিনটি সোনার কানের দুল, তিনটি সোনার আংটি একটি সোনার দড়া হার, ছয়টি জসম, সাতটি সোনার মালা, একটি সোনার বাদামী ধূকধূকী (পেণ্ডেণ্ট), এক জোড়া ডায়মণ্ডকাটা পাথর বসান কাণফুল, ৬০টি গোল ফাঁপা সোনার দানাযুক্ত মালা। এই সব সামগ্রী পার্থীয় (পারদ) যুগের শিল্প-নিদর্শন। এখানে আর এক অংশে সাসনিয়া রাজা সাপাডেনস্ ও কুষাণ রাজা ২য় কদফিসের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এই সৌধের অপর পার্শ্বে একটি স্তূপ ছিল। তাহার পার্শ্বের মহল্লায় আর একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এইটি এক জৈন ধর্ম্মমন্দির ছিল। সৌধের পশ্চিম অংশে সিঁড়ি ও দুই পার্শ্বে চারিটি করিয়া আটটি কোরিন্থিয়ান প্রথায় গঠিত স্তম্ভ দেখা যায়। তাহাদের মাথায় অবলম্বনী ও মধ্যে কুলুঙ্গী আছে। সিঁড়ির ঠিক ধারের কুলুঙ্গীর খিলানের মাথা গ্রীক পরিকল্পনার ত্রিভুজাকৃত, মধ্যস্থলের কুলুঙ্গীর খিলান বাঙ্গালা দোচালা ধরণের। শেষের খিলানদ্বয় ভারতীয় তোরণের আকৃতির ন্যায়। মধ্যের ও প্রান্তের কুলুঙ্গীর উপর ঈগল পক্ষীর মাথার আকারে বন্ধনী বসান হইয়াছে। একটি আবার দুইটি ঈগল পাখীর মাথাযুক্ত। ইহা হইতে এই মন্দিরের নাম পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ "ডবলহেডেড্ ঈগল টেম্পল" দিয়াছেন। মার্শাল সাহেবের

মতে, এই স্থাপত্য-ধারা, শকশিল্পিগন প্রথমে তক্ষশিলায় প্রবর্ত্তন করেন, কালক্রমে বিজয়নগর ও সিংহলে ইহার অনুকরণ হয়।

পরবর্ত্তী মহল্লার এক সৌধের দুইটি প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর-গাত্রে শ্বেতপাথরের উপর আর্ম্মিক (এ্যারামিক) অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহার পরের পল্লীতে আর একটি জৈন মন্দির, তাহার গম্বুজ, অণ্ড ও ছত্র পড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটি পাথরের আধারের মধ্যে একটি সোনার কৌটা পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একখণ্ড অস্থি, সোনার পাত ও মালা ছিল এবং পাথরের বাক্সর মধ্যে শকরাজা ১ম এজেসের ৮টি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

তৎপর কয়েকটি মহল্লা অতিক্রম করিলে তক্ষশিলার রাজার প্রাসাদ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি রাস্তা বড় রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। বড় রাজপথের দিকে প্রসাদটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩৫০ ফিট দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ ফিট প্রস্থ। প্রাসাদের সপ্ত-তোরণের চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। প্রাসাদটি অন্দর, রাজসভা, রক্ষী, কার্য্যালয়, স্নান, মন্ত্রণা, রন্ধন প্রভৃতি মহলে বিভক্ত। প্রত্যেকটি মহলের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও প্রতি মহল প্রাচীর দিয়া ঘেরা। অন্দরমহল সুরম্য ও সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত, ইহার মধ্যে পৃথক পরিচারিকা-মহল এবং পূজার মহল। পূজার মহলে

একটি স্তূপ ছিল, তাহার ভিত এখনও দেখা যায়। অন্দর-মহলে পুষ্করিণীর আকারে বড় বড় টেরাকোটার জলপাত্র কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে একটি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জলপাত্রগুলির মধ্যে অবতীর্ণ হইবার জন্য সিঁড়ির ধাপ আছে এবং চারি কোণে চারিটি দীপদানী বসান আছে। মনে হয়, এই জল-পাত্র পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য দান করা হইত। জলদানের প্রথা অতি প্রাচীন। মার্শাল সাহেব বলেন, এই প্রকার জলপাত্র তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে এবং খৃঃ পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দে এজিয়ান দ্বীপে প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্বদিকের মহলে প্রকাশ্যে রাজসভা বসিত, তদুপযোগী একটি বড় মঞ্চের চিহ্ন দেখা যায়। সে-যুগেও গণতন্ত্রের প্রচলন পূর্ণমাত্রায় ছিল, সে যুগের রাজা, প্রজার সকল রকম সুখ-সুবিধার জন্য স্নেহময় পিতা ও মঙ্গলময় বিধাতার ন্যায় কল্যাণ-সাধন করিতেন। প্রজারা সুখে-সচ্ছলে কালাতিপাত করিত, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইত, নির্ভাবনায় স্বাধীন চিন্তা করিয়া মানবের কল্যাণকর নব নব দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিত।

এই মহলের পশ্চাতে মন্ত্রী ও সভাসদগণের কাছারি ও বসিবার অনেকগুলি ঘর ও দালান। তাহার সন্নিহিত কক্ষে অতিথি-অভ্যাগতজনের সম্বর্দ্ধনা হইত।

প্রাসাদটি বৃহৎ ও সুদৃঢ়, কিন্তু রাজপ্রাসাদোচিত আড়ম্বরপূর্ণ কারুকার্য্যে শোভিত ছিল না। এ্যাপোলোনিয়াসের

জীবনী-লেখক ফিলোস্ট্রাটাস্ এই প্রাসাদের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ এই প্রাসাদ। সেইজন্য এই সৌধাবলীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিচয় এখন যাহা মার্শাল সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত। এরূপ পরিকল্পনায় নির্ম্মিত দ্বিতীয় আর একটি নগর বা প্রাসাদ ভারতবর্ষে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোন একটি পাত্রের মধ্যে ১ম ও ২য় এজেসের, অশ্ববর্ম্মার, গোণ্ডোফারসের, হার্ম্মিয়াসের এবং কজ্জুল কাদফিসের ৬১টি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী এক-গৃহ-মধ্য হইতে ২য় এজেসের মুদ্রার মৃত্তিকার ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের অপসারণের সময় বহু সংখ্যক মৃণ্ময় মূর্ত্তি, মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ, তামা ও লৌহের নানা প্রকার দ্রব্য, রঙিন পাথরের ও মুক্তার মালা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সমতল ভূমির উপরিস্থ এই নগরের অংশ অতিক্রম করিয়া উহার অপর অংশ ক্রমশঃ হাতিয়াল পাহাড়ের উপর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত রহিয়াছে দেখা যায়। নগরের প্রাচীরও পাহাড়ের দক্ষিণ ধারে ও পশ্চিম দিকে নগর বেষ্টিয়া আছে। এখনও সেই প্রাচীরের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ে উঠিবার মুখে দক্ষিণ ধারে নগর-প্রাচীরের সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে "কুণাল স্তূপ" অবস্থিত; তাহার পূর্ব্বে একটি বৃহৎ মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে আরো দুইটি পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত শিরকাপ নগর বিস্তৃত। এই অংশে গৃহ, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, মঠের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। সর্ব্ব শেষ দিকে পাহাড়ের উপর সুদৃঢ় একটি সৌধ বর্ত্তমান, সেইটী নগরের শেষ আশ্রয়, ইহা দুর্গম-দুর্গ বলিয়া খ্যাত। এই দুর্গের একটিমাত্র প্রবেশ দ্বার।

শিরসুখ

তক্ষশিলার তৃতীয় নগর শিরসুখ, শিরকাপ সহরের উত্তর-পূর্ব্বে ১।।০ মাইল দূরে লুণ্ডীনালার উত্তর তীরে অবস্থিত। এই নগর খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দে কুষাণ নরপতিগণের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে শিরসুখ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। খৃষ্টিয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত তক্ষশিলার এই অংশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরে ফা-হিয়ান ও হিউয়ান সাং বাস করিয়াছিলেন। হুনগণের নৃশংসতায় এই মহানগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হিউয়েন সাং ৫২৯ ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তখন তিনি শিরসুখ নগর দেখিয়া লিখিয়াছেন "নগরের আয়তন ১০লী অর্থাৎ ১½ মাইল দীর্ঘ। শিরকাপ ও বীরমণ্ডল নগরদ্বয় পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।" সর্ব্বশেষ কালে শিরসুখ নগর প্রস্তুত হইলেও এই নগরের ঐশ্বর্য্য চিহ্ন অতি বিরল, নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং নগরের

সীমানার মধ্যে মীরপুর, তফ্‌কিয়ান, পিণ্ডগোখরা নামে তিনটি গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে।

শিরসুখ নগর সম-আয়ত-ক্ষেত্র আকারে সমতল ভূমির উপর গঠিত হইয়াছিল। নগরের চারিদিক সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। চারিদিকের প্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল এবং প্রস্থে ১২ হাত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের প্রাচীর কিঞ্চিৎ অভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রাচীরের সামান্য স্বরূপ উপলব্ধি হয়। প্রাচীরের বাহিরের ছাঁটাই করা সমান আকারের পাথরে গাথা ও উহা সমতল কিন্তু ভিতর দিকে উহার গাত্র অসমতল। পরবর্ত্তীকালে এই প্রাচীর ছড়-দেওয়াল দ্বারা দৃঢ়তর করা হইয়াছে। বাহির দিকে ৯০ ফিট অন্তর অর্দ্ধগোলাকার বুরুজ নির্মিত হইয়াছিল। বুরুজের অভ্যন্তরে যাইবার জন্য প্রাচীরের মধ্যদিয়া পথ রাখা হইত। বুরুজ ও প্রাচীরের মধ্যস্থলে পাঁচ ফিট উচুতে অস্ত্রচালনার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিত।

একটি বুরুজের মধ্য হইতে হারমিয়াস ও ২য় কদফিসের সময়ের তাম্র-মুদ্রা ও হস্তি-দন্ত নির্মিত দর্পণের একটী হাতল পাওয়া গিয়াছে। আকবর বাদসাহের ৫৯টী তাম্র-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তক্ষশিলার নগরত্রয় মোগল যুগের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে মৃত্তিকা গর্ভে চাপা ছিল। আকবরের টাকা এইস্থানে পাওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

নগরের এই অংশে দুইটী বৃহৎ সৌধের চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবত একটি প্রাসাদ, অপরটি রাজ্যশাসন-কার্য্যালয়। এই সব সৌধের মধ্য হইতে বড় মাটির জালা, ২য় কদফিসের কণিষ্কের ও বাসুদেবের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এই নগরত্রয়ের চারি পার্শ্বে সহরতলী ও পাহাড়ের উপর প্রায় ৮।১০ মাইল ব্যাপিয়া বহু বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, সঙ্ঘারাম, বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে আড়াই হাজার বৎসরের শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ, কুণাল স্তূপ, জাণ্ডিয়ালের সূর্য্য মন্দির, মর্হামোরাদুর সঙ্ঘারাম, জৌলিয়া পাহাড়ের মঠ, বহ্লার স্তূপ, পিপালার মঠ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ

সারনাথে যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন সেই পুণ্যপীঠে মহারাজ অশোক একটী বৃহৎ স্তূপ এবং সুমসৃণ চারিটি সিংহ-শিরযুক্ত স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্তূপটির নাম ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ। এই ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের বিবরণ ও নামের ইতিহাস বর্ত্তমান লেখকের "চার পুণ্যস্থান" গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। সম্রাট অশোক সারনাথ ব্যতীত আরো কয়েক স্থানে বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ এবং

কোন কোন স্থানে তাঁহার অস্থি-রক্ষার উদ্দেশ্যে বড় বড় কয়েকটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই স্তূপগুলিও 'ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ' নামে খ্যাত। তক্ষশিলাতেও সেইরূপ একটি "ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ" নির্মিত হইয়াছিল।

ষ্টেশন হইতে একমাইল পূর্ব্বে বীরমণ্ডল নগরের প্রান্তে তাম্রনালার নদীর তীর হইতে উত্থিত হাতিয়াল পর্ব্বতের উপর ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহা 'চিরটোপ' নামে খ্যাত। এই স্তূপ সমুদ্র-জল-পৃষ্ঠ হইতে ১৭৫১ ফিট উচ্চস্থানে অবস্থিত। তক্ষশিলার ঐশ্বর্য্যের সময়ে, যখন নগরবাসীরা স্তূপ-পাদমূলে দীপদান করিতেন তখন স্তূপের অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য শত সহস্র নরনারীর চিত্তে পুলক-সঞ্চার ও শান্তি-প্রদান করিত; আকাশ বাতাস আলোড়িত হইয়া ধ্বনিত হইত--

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ॥
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ॥
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

সে-সুখ-শান্তিময় জীবন বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যুগে কল্পনাতীত।

স্তূপটি অর্দ্ধগোলাকৃতি, ইহার পাদদেশ বেষ্টিয়া উচ্চ রোয়াক অবস্থিত। স্তূপের অভ্যন্তরে পাথরের ভরাট গাথুনী; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্তূপের বহিগাত্র নানা প্রকার পাথর ও চুন-বালির অস্তর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবরিত হইয়া স্ফীতকায় হইয়াছে।

বর্ত্তমানে অশোক মহারাজের যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

শেষ গাত্রাবরণ কুষাণ যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ চুনা ও কুঞ্জর প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার উপর বালিচুণের অস্তর দ্বারা আবৃত হয়। উপরিভাগে কারুকার্য্য-বিশিষ্ট স্তম্ভ, মূর্ত্তি, কুলঙ্গী, অবলম্বনী, দাঁতওলা কার্ণিশ স্তূপটির শোভা বর্দ্ধন করে। কুলঙ্গীগুলির খিলান ত্রিপত্রাকৃত ক্ষুদ্র-দ্বারসম্বলিত এবং দুই পার্শ্বে কেরিন্থিয়ান ছাঁচের গাত্র-স্তম্ভ-শোভিত। প্রত্যেক কুলঙ্গীর মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

মার্শাল সাহেব লিখিয়াছেন সম্রাট কনিষ্ক দ্বারা এই স্তূপটির আমূল সংস্কার হয় এবং চতুর্থ খৃষ্টাব্দে স্থানে স্থানে সংস্কৃত হইয়াছিল। রোয়াকে উঠিবার চারি-ধাপযুক্ত সিঁড়ি চারিদিকে ৪টি আছে। রোয়াক ও স্তূপ বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ-পথ রহিয়াছে। বুদ্ধভক্তগণ স্তূপ প্রদক্ষিণ একটি পরম পুণ্য কাজ বলিয়া গণ্য করেন। প্রদক্ষিণ পথটির খনন হইলে দেখা যায় যে ইহার উপর উপর কয়েকটি স্তর বিন্যস্ত হইয়াছে। একটি স্তর শঙ্খ-বলয় ভাঙ্গা দিয়া চিত্রিত, আর একটি স্তর রঙ্গিন কাঁচের টালির দ্বারা আবৃত, শেষ স্তরটি পাথর দ্বারা মণ্ডিত। সে যুগেও নানা রংএর কাঁচ নির্ম্মিত হইত, ইহাই তাহার প্রমাণ।

স্তূপের পূর্ব্বদিকের সোপানের পার্শ্বে মোটা স্তম্ভের পাদপীঠ অবস্থিত। সম্ভবত সিংহশিরযুক্ত অশোকস্তম্ভ এই

স্থানেই স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সিংহ-মাথা-যুক্ত স্তম্ভ-শির শিরকাপ নগরে পাওয়া গিয়াছে এবং তক্ষশিলার যাদুঘরে সংগৃহীত আছে।

প্রদক্ষিণ-পথের পার্শ্বে বোধিসত্ত্বের একটি মনোরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিসত্ত্বের অর্থ—সাধুপুরুষ, যাঁহার চরিত্রের প্রধান আদর্শ বোধি বা পরমাত্ম-জ্ঞান ও মুক্তিলাভ। এখানে বোধি-সত্ত্বের মূর্ত্তি ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, মারিচী, সামন্তভদ্র, বজ্রপা এবং মৈত্রেয় নামে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্তূপের চারিদিক খনন করিবার সময় ৩৫৫টি মুদ্রাসহ একটি আধার পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি ২য় এজেস্, সোটের মেগস্, হবিষ্ক ও বাসুদেব নরপতিগণের নামাঙ্কিত।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ ঘিরিয়া বহু স্তূপ, বিহার, উপাসনা-গৃহ ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি উপাসনা-গৃহের মধ্যে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। সেই মূর্ত্তির পদদ্বয় ও পরি-চ্ছদের নিম্নাংশ এখনও দেখা যায়। বুদ্ধমূর্ত্তির পদের গোড়ালি হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ৫ ফিট তিন ইঞ্চি। এই মাপ অনুসারে মূর্ত্তিটি ৩৫ ফিট উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং তদনুসারে ভজনালয়ের দালান নিশ্চয় ৪০ ফিটের অধিক উচ্চ ছিল।

ইহার নিকট একটি বৃহৎ চৈত্য ছিল, তাহার অভ্যন্তরের

এক কক্ষ হইতে রূপার পাতের উপর খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটী লিপি পাওয়া গিয়াছে। এক পাথরের মধ্যে রূপার ভাণ্ডের ভিতর রৌপ্য লিপিটি রক্ষিত ছিল। তাহার সহিত একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কৌটা ও কয়েক টুক্‌রা অস্থি পাওয়া গিয়াছিল। লিপিতে ১৩৬ সাল উৎকীর্ণ আছে, এই সাল ৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। এই লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অস্থি। লিপির ভাবার্থ মার্শাল সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন।

"রাজা এজেসের রাজত্বকালে, ১৩৬ সালে অশ্বয্যা (আষাঢ়) মাসের পঞ্চদশ দিবসে, তক্ষশিলার ধর্ম্মরাজিকা স্তূপে বোধিসত্ত্ব চৈত্যো উরাসাকার দ্বারা এই পবিত্র অস্থিখণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। উরাসাকা নোয়াচা নগরবাসী জনৈক ব্যাকট্রীয় গ্রীক। এই পবিত্র অস্থি-স্থাপনের ফলে রাজাধিরাজ কুষাণ নরপতির স্বাস্থ্যের মঙ্গল হউক, সকল বুদ্ধের, প্রতিটি বুদ্ধের, প্রতি অর্হতের, সকল সাধুজনের আমার পিতৃপুরুষগণের, আমার বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি-কুটম্ব এমন কি আমার বংশের রক্তধারা যাহার ধমনীতে প্রবাহিত এমন সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও শান্তি-লাভ-কামনায় এই পবিত্র অস্থি স্থাপিত হইল। হে ভগবান বুদ্ধ! আপনারই আশীর্ব্বাদে সকলে যেন নির্ব্বাণ-লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে।"

এই লিপি প্রমাণ করে, বহ্লীক ও কুষাণগণ বুদ্ধের পরম

ভক্ত ও বৌদ্ধ ছিল। তক্ষশিলাই সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র।

কুণাল স্তূপ

হিউয়েন সাং তক্ষশিলায় আসিয়া শিরসুখ নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন তক্ষশিলা তিনশত বর্ষের বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত ও হতশ্রী নগর। তথাপি তিনি তক্ষশিলার স্থাপত্য ও শিল্প-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উহার চারিটী স্থাপত্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের নাম—"এলাপাত্র সরোবর". "চতুঃরত্ন স্তূপ", "মস্তকপ্রদান স্তূপ" ও "কুণাল স্তূপ"।

হিউয়েন সাং শিরকাপ নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর, সহরবাসীর দৃষ্টিপথের মধ্যে ১০০ ফিট উচ্চ "কুণাল স্তূপ" অবস্থিত লিখিয়াছেন। সেই স্থানেই বর্ত্তমান স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এখন রহিয়াছে। তিনি কুণাল স্তূপটির স্থাপনের এক অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—

"সম্রাট অশোকের পুত্র যুবরাজ ধর্ম্মবিবর্দ্ধন অতি সুপুরুষ তাঁহার আঁখি-তারা 'হিমবত' পক্ষীর চক্ষুর ন্যায় ছোট, সুন্দর, উজ্জ্বল ও মনোহারী। অশোক সেইজন্য তাঁহার পুত্রের নাম 'কুণাল' রাখিয়াছিলেন। অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী তিষ্যারক্ষিতা কুণালের চক্ষুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হন। সপত্নী পুত্রকে প্রেমাস্পদ রূপে পাইবার অভিলাষ পর্য্যন্ত ব্যক্ত

করেন। কুণাল ঘৃণা ও লজ্জার সহিত এই হীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আশাহত তিষ্যারক্ষিতা প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং কুণালের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। তিনি মন্ত্রীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে কুণালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন এবং অশোকের নাম জাল করিয়া এক আদেশ পত্র পাঠান। সেই পত্রে কুণালকে তাহার চক্ষুদ্বয় স্বহস্তে উৎপাটন করিবার আদেশ ছিল। ধর্ম্মভীরু কুণাল পিতৃ-আদেশ প্রতিপালন করেন। পরে যখন অন্ধ রাজপুত্র পত্নীর হাত ধরিয়া অশোকের সমীপে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট তাঁহার পুত্রের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারেন এবং রাণীর ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হন। রাণীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তৎপরে অর্হত ঘোষার সাধনার বলে বুদ্ধগয়াতে কুণালের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে। (ঘোষা তক্ষশিলার একজন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন।) ব্যথিত অশোক পুত্রের পিতৃ-আজ্ঞা পালনের নিষ্ঠা স্মরণার্থে, তাহার চক্ষু-উৎপাটন-স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই স্তূপই "কুণাল স্তূপ" নামে খ্যাত। (ওয়াটার্স সাহেবের "হিউয়ান সাং ট্রাভেলস্ ইন্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকের ২৪৬ পৃষ্ঠায় কাহিনীটি মুদ্রিত আছে, তাহারই অনুবাদ)

কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে কুণালের এই নির্ম্মম কাহিনী অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্তূপটি ১০৫ ফিট লম্বা ও ৬৩ ফিট

প্রস্থ পোস্তার উপর নির্ম্মিত। পোস্তাটির পেট ঈষৎ স্ফীত এবং তিন থাকে গঠিত। সর্ব্ব নিম্ন থাক খর্ব্বাকৃত করিন্থিয়ান ছাঁচে সারি সারি গাত্র-স্তম্ভ দ্বারা শোভিত। স্তম্ভের মাথলায় দন্তাকৃতির কার্ণিস বিন্যস্ত। মধ্যের স্তর সাদাসিধা, উপরের স্তরটি কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং নিম্নের থাক অপেক্ষা তিনগুণ বড়। স্তম্ভের উপর যে "উষ্ণীষ" (কোপিংস) সমূহ ন্যস্ত ছিল তাহার শীর্ষভাগের ও কার্ণিসের মধ্যে হিন্দু স্থাপত্য-ধারার অবলম্বনী (ব্রাকেট) স্থাপিত ছিল। স্তূপের উপরের আকার ও কারুকার্য্য "বহ্লার স্তূপেরই" অনুরূপ। গোলাকার উচ্চ বপু থাকে থাকে কাটান দিয়া সপ্তস্তরে ১০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। প্রতি স্তর ছোট ছোট গাত্রস্তম্ভ, কুলঙ্গী, দাঁতওলা কার্ণিস, লতা-পাতা খোদিত উড়াপটী দ্বারা শোভিত। সমস্তই পাথরে নির্ম্মিত অতি মনোহর। ইহার 'অণ্ডের' (ডোমের) উপর একাধিক ছত্র স্থাপিত ছিল।

এই স্তূপের গঠনের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার পোস্তা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার ন্যায় ঈষৎ ঠেলা (কনকেভ) হইয়া আছে। মার্শাল সাহেবের মতে—"বর্ত্তমান স্তূপটী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্ব্বে গঠিত হয় নাই। অশোক-নির্ম্মিত স্তূপের সহিত এই স্তূপের সাদৃশ্য দেখা যায় না। তবে এই স্থানের প্রাঙ্গণের এক অংশে যে একটি অর্ঘ-স্তূপ আছে তাহার স্থাপত্য অশোক-যুগের সমসাময়িক।

স্তূপের পশ্চিমে এক উচ্চ পোস্তার উপর একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

মস্তক-দানের স্তূপ

নগরের দ্বাদশ লী উত্তরে এক উচ্চ ভূমির উপর "মস্তক—প্রদান স্তূপ" অবস্থিত। হিউয়েন সাং এই স্তূপের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"প্রাচীনকালে স্তূপটি সুন্দর ও কারুকার্য্যে মণ্ডিত ছিল। স্তূপ হইতে একপ্রকার জ্যোতি সর্ব্ব সময় নির্গত হইত। স্তূপটি এক ভগ্ন মঠের সংলগ্ন ছিল। মঠে তখন অতি অল্প সংখ্যক ভিক্ষু বাস করিত। কুমারলব্ধ নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক সেই মঠে বাস করিতেন, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে আমি দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বজন্মে ভগবান বুদ্ধ অন্নভিক্ষাদানের বিনিময়ে নিজ মস্তক দিয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল" (ওয়াটার্স ২৪৫ পৃঃ)।

জাণ্ডিয়াল

মিউজিয়াম গৃহ হইতে দেড় মাইল দূরে, শিরকাপ নগরের উত্তরে উচ্চ ঢিবির উপর অগ্নি-উপাসনার একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট আবিষ্কার হইয়াছে। মন্দিরের দ্বার শিরকাপ নগরের তোরণের দিকে সম্মুখ করিয়া অবস্থিত।

মন্দিরের সম্মুখ হইতে সর্ব্ব পশ্চাতের দেওয়াল পর্য্যন্ত ১৫৮ ফিট দীর্ঘ, এবং দুই পার্শ্বের স্তম্ভশ্রেণী লইয়া প্রস্থে ১০০ ফিট। মন্দির সম-আয়ত ক্ষেত্র আকার, সৌধটির চারি পার্শ্বে মোটা স্তম্ভের সারি ছিল। স্তম্ভগুলির উপর বারাণ্ডারছাদ ন্যস্ত ছিল। সম্মুখে দুইজোড়া স্তম্ভের উপর গাড়ি-বারাণ্ডার ছাদ ছিল। দুই পার্শ্বে ৮টি করিয়া ষোলটি এবং পশ্চাতে ৪টি স্তম্ভের গোড়া এখনও সৌধের বিশালতা প্রমাণ করে।

গাড়ি-বারাণ্ডার পর একটি চত্বর, তার ভিতর দুইটি মোটা স্তম্ভের মধ্যস্থানে উচ্চ প্রবেশ-দ্বার, দুই পার্শ্বে দুইটি কুঠরি। তাহার পশ্চাতে ভরাট গাঁথুনীর ভিত বিশ ফিট্ মাটির ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানে মন্দিরের চূড়া ছিল। মার্শাল সাহেব অনুমান করেন, এই বিরাট গম্বুজ ৪০ ফিট্ উচু ছিল। পশ্চাতের বেদীতে উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপ এখনও আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই বেদীতে অগ্নি-পূজা হইত। এখানে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মূর্ত্তির নিদর্শন নাই। ভারতীয় কোন বিশেষ স্থাপত্য-ধারায় মন্দিরটি গঠিত হয় নাই।

সেইজন্য মার্শাল আদি পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই মন্দির জোরষ্ট্রীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের অগ্নি ও সূর্য্য-উপাসনার মন্দির। বিখ্যাত পার্শী পণ্ডিত ডাঃ জে, মোডী ১৯১৫ খৃঃ, ১২ই আগষ্টের 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায়' এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তক্ষশিলার মতন আন্তর্জাতিক

নগরে "অগ্নিবেদী" প্রকাশ্যে স্থাপন করা সন্দেহ-জনক।

এই প্রকারের দ্বিতীয় একটি মন্দির ভারতবর্ষে কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে এই মন্দিরের পরিকল্পনার সহিত গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের পরিকল্পনার আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য আছে; মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের যুগের স্থাপত্য-ধারার মতন। পার্থীয়দের সময় মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় তক্ষশিলায় জোরষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রভাব ছিল

এ্যাপোলনিয়াসের জীবনী-লেখক ফিলস্ট্রোটাস শিরকাপ নগরে প্রবেশ করিবার জন্য রাজার নিকট আজ্ঞাপত্র পাইবার আবেদন করিয়া এই মন্দিরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের বর্ণনা-সময় তিনি লিখিয়াছেন, "মন্দিরটি একশত ফিট লম্বা এবং পাথরে প্রস্তুত। মন্দিরের গঠন সাদাসিধা হইলেও সুন্দর। ইহার দেয়ালে প্রস্তরগুলি পিত্তল ফলক ও গজালের দ্বারা সংযুক্ত। একটি ফলকে আলেক্‌জেণ্ডারের ও পুরুর জীবন কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ ছিল।" তাঁহার বর্ণনা অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে—শিরকাপ নগরের উত্তর-তোরণের সম্মুখে এই মন্দির অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানেও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও শিরকাপ নগরের তোরণের অংশ একস্থানেই দেখা যায়।

মোহ্রা মোরাদু

মিউজিয়াম হইতে একটি রাজপথ বামদিকে শিরসুখ নগর ও ডানদিকে বহু ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া দক্ষিণে গিয়াছে। ইহার প্রান্তে যে উপত্যকা পূর্ব্বস্থিত হাতিয়াল পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাই "মোহ্রা-মোরাদু"। জনমানব-হীন প্রকৃতি-রাণীর রম্যলীলাস্থানে প্রবেশ করিলে, সংসারের সকল ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কলহ-দূষিত আবহাওয়া হইতে দূরে এক অপূর্ব্ব শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি মনে হয়।

এইস্থানে একটি স্তূপ ও একটি বিহার পাশাপাশি অবস্থিত। পশ্চিমদিকে স্তূপ এবং পূর্ব্বদিকে বিহারটি। স্তূপটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে কুষাণ যুগে নির্ম্মিত বলিয়া মার্শাল সাহেবের মত।

স্তূপের গাত্র অনেক ছোট ছোট স্তম্ভদ্বারা থাকে থাকে এবং খোপে খোপে বিভক্ত। স্তরে স্তরে নানা মুদ্রায় ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি সজ্জিত। পূর্ব্বদিকের সোপানের উপর দুইপার্শ্বে সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তি বসান ছিল। কয়েকটি বৃহৎ দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পশ্চাতে অসংখ্য মূর্ত্তি বিরাজিত। দেখিলে মনে হয়, যেন মেঘের মধ্য হইতে ঐগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিগুলি সমস্ত চুণ-বালির পলস্তারায় মণ্ডিত এবং নানা রংএ রঞ্জিত। মূর্ত্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব ও কাপড়ের ভাঁজের ভঙ্গিমা অতি মনোহর। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত সচল ও ভাবব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি

মূর্ত্তি শিল্পীর সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্য এবং নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রমান প্রদাণ করে।

সঙ্ঘারামের ঘরগুলির ভিতর ও বারাণ্ডার প্রাচীর গাত্র নানা রংএ চিত্রিত। ছাদের কাষ্ঠের অবলম্বন কারুকার্য্যময় এবং সোনালি রংএ রঞ্জিত। প্রতি কক্ষের সম্মুখে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত এবং কুলুঙ্গীর মধ্যে বসা বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। মার্শাল সাহেব এই মূর্ত্তিগুলি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গঠিত বলিয়া অনুমান করেন। এই বিহারের একটি কক্ষ হইতে সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ অভগ্ন বার ফিট উচ্চ প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পাদপীঠ পাঁচটী বন্ধনীতে বিভক্ত। সর্ব্বনিম্ন বন্ধনীর স্তরে পর্য্যায়ক্রমে হস্তী ও মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত এবং উপর স্তরে কুলুঙ্গীর সারি, তাহার মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। স্তূপের শিরে লৌহদণ্ডে গ্রথিত সাত থাক বিশিষ্ট ছত্র শোভিত ছিল। ছত্রগুলির ধারে ধারে ছিদ্র রহিয়াছে। ভক্তগণ মালা ও পতাকা বাঁধিয়া দিত এই ছিদ্রগুলিতে। এই স্তূপ সে যুগের স্তূপ-স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই বিহারের মধ্যে প্রঙ্গণ, চারিদিকে ভিক্ষুদের থাকিবার কুঠরী, স্নানাগার, ভজনশালা, ভোজনশালা, রন্ধনশালা, ভাণ্ডার ও শৌচাগার স্থাপিত। সৌধটি খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইস্থান হইতে হবিষ্ক ও বাসুদেবের অনেক মুদ্রা, 'হরিশ্চন্দ্র' নামাঙ্কিত

গুপ্তযুগের একটী মোটা পাথরের শীলমোহর এবং অক্ষত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

জৌলিয়া

মোর্হা-মোরাদু হইতে উত্তর-পূর্ব্বে এক মাইল দূরে তিনশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর জৌলিয়ার স্তূপ ও মঠ অবস্থিত। এখানকার মূর্ত্তি ও সৌধগুলি মোর্হা-মোরাদুর স্তূপ ও মঠ অপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য-বিশিষ্ট এবং অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সমস্ত সৌধের মূর্ত্তির গঠনকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী এবং ধ্বংসের সময় পঞ্চম শতাব্দী নির্দ্ধারণ করেন। সেই যুগে তক্ষশিলার রাজধানী শিরসুখ নগর ছিল।

জৌলিয়ার সৌধাবলীর মধ্যে একটি বৃহৎ মঠ ও দুইটি স্তূপ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন উচ্চ ঢিবির উপর স্তূপ দুইটি অবস্থিত। সর্ব্ব উচ্চ স্থানটির নিম্নের স্তূপটির দক্ষিণে। প্রবেশপথে পর পর তিনটি তোরণ অবস্থিত। উপরে উঠিয়া প্রথমে প্রাঙ্গণ, চারিদিকে কুঠরী, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল এবং ছোট ছোট পাঁচটি স্তূপ বর্ত্তমান। স্তূপগুলির গাত্র চূনবালি দিয়া নির্ম্মিত অসংখ্যবুদ্ধ-মূর্ত্তি, জীবজন্তু, লতাপাতা দ্বারা শোভিত। বড় স্তূপের কুলুঙ্গীর মধ্যে প্রমাণ আকারের, এমন কি ১২ ফীট উচ্চ বুদ্ধ-মূর্ত্তি অবস্থিত। খিলানের উপর সারি সারি করী ও সিংহ-মূর্ত্তি খোদিত আছে।

উত্তরদিকে এক অর্দ্ধগোলাকৃত খিলানযুক্ত বৃহৎ কুলুঙ্গীর

মধ্যে প্রমাণ অকারের মনোরম ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি বসান আছে। তাহার পাদপীঠে খরোষ্ঠি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। বুদ্ধমিত্র এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্যাধি-গ্রস্ত নর-নারী ভক্তিভরে এই মূর্ত্তির পদস্পর্শ করিলে রোগমুক্ত হইত।

প্রধান স্তূপ বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি স্তূপ বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে একটি স্তূপের গাত্রে মনোরম বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। (তাহার চিত্র এই পুস্তকে সম্বলিত হইল) মূর্ত্তিটি অভগ্ন এবং সুন্দর। স্তূপটি নানা রত্ন ও রং দ্বারা আবরিত ছিল। এই ১১ নং স্তূপটির সম্মুখে প্রধান স্তূপের গাত্রে এক বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার পশ্চিমে ১৫ নং স্তূপের একটি মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে—"সজ্ঘমিত্রস্যা বুদ্ধদেবস্যা ভিক্ষুখা দানমূখী" অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রীতির জন্য ভিক্ষু সজ্ঘমিত্রর দানে স্থাপিত। এই স্থানে খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিমালার কাল পঞ্চম শতাব্দীর বলিয়া মার্শাল সাহেব অনুমান করেন।

বহল্লার স্তূপ

সর্দ্দা পর্ব্বতের শেষ শিখরের ঢালুতে সৌন্দর্য্যের মধ্যে চারিদিক খোলা অতি উত্তম লক্ষ্যস্থানে হারো উপত্যকাভিমুখে এই বহল্লার স্তূপ দণ্ডায়মান। তক্ষশিলা ষ্টেশন হইতে হাভেলিন রেলপথে প্রায় পাঁচ মাইল যাইলে হারো নদীর অর্দ্ধমাইল উত্তরে এই স্তূপ।

হিউয়েন সাং এই স্তূপটির বিষয় লিখিয়াছেন—'তক্ষশিলার

প্রায় বার লী উত্তরে একটি স্তূপ দেখিতে পাই, দূর হইতে স্তূপগাত্র হইতে নির্গত জ্যোতি দেখিতে, পুষ্পগন্ধের ঘ্রাণ ও মধুর সঙ্গীত-ধ্বনী শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি এই স্তূপটিকে মস্তক প্রদান স্তূপ এবং অশোক দ্বারা নির্ম্মিত লিখিয়াছেন। তিনি যখন এই স্তূপের নিকট আগমন করেন তখন তাহার পার্শ্বস্থিত মঠে কয়েকজন মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। এই মঠে বসিয়া সাস্ত্রলিক্যা বৌদ্ধ গ্রন্থটী একজন সুপণ্ডিত চিকিৎসক রচনা করেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তিনি কুমারলব্ধ নামে পরিচিত এবং যাঁহার নাম হিউয়েন সাং চীন ভাষায় কৌমো-লো-লো-টো উল্লেখ করিয়াছেন। (হিউয়েন সাং জীবনী, ওয়াটার্স এর অনুবাদ গ্রন্থ পৃঃ ২৪৫)

হিউয়েন সাং আরো লিখিয়া গিয়াছেন যে, এইস্থানে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে পুষা বা চন্দ্রপ্রভা নামে রাজা ছিলেন। দানের মহিমা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি নিজ মস্তক প্রদান করেন। এই স্থানের সেই পুণ্য কীর্ত্তি স্মরনার্থে সম্রাট অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহাই 'মস্তক প্রদান স্তূপ' বলিয়া খ্যাত।

স্যার জন মার্শাল সাহেব অশোকের নির্ম্মিত স্তূপের কোন চিহ্ন পান নাই। বর্ত্তমান স্তূপ মধ্যযুগ অর্থাৎ কুষাণ যুগের পূর্ব্বে কিছুতেই নির্ম্মিত হয় নাই এইরূপ মত প্রকাশ করেন। স্বাভাবিক স্তূপের গঠন-পদ্ধতির অনুসরণে এই স্তূপের 'অণ্ড' বা অর্দ্ধ গোলাকৃত নিরেট দেহ এবং গম্বুজ নির্ম্মিত ও

ইহার শিরোপরি ছত্র স্থাপিত ছিল। এই গম্বুজটি তাহার ব্যাসের তুলনায় অনেক উচ্চ এবং ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া সপ্ত থাকে বিভক্ত।

স্তূপ-পাদমূলের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছোট বড় স্তূপ ও নানা সৌধ স্থাপিত ছিল, সেইগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এক বিরাট মঠের (সঙ্ঘারাম) ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশিষ্ট অবিষ্কৃত হইয়াছে।

তক্ষশিলার মনোরম উপত্যকায় দাঁড়াইয়া যে দিকে আঁখি ফিরাই বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখি। যেন বুদ্ধময় জগত দেখি। তাঁহার চরণাশ্রয়ে এই মহাহিংসায় উন্মত্ত জগৎবাসীর শান্তির জন্য প্রার্থনা করি—

মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান! মরতে মহিমায়,
সহিছে অবিচার নিঠুর অবিচার
রোদন হাহাকার গগন মহীছায়।
নিরীহ মানবের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়!
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজ শরণে পুনরায়॥

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজগৃহ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে রাজগৃহ জগতে সুপরিচিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে মগধের রাজধানী—'গিরিব্রজ', 'কুশাগ্রপুর ও 'রাজগৃহ' এই নামে খ্যাত। মহাভারতের সভা ও বনপর্ব্বে উল্লেখ আছে—মগধের রাজধানী গিরিব্রজ পঞ্চশৈল দ্বারা পরিবৃত্ত সুরক্ষিত নগরী।

বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন—মগধরাজধানী পঞ্চগিরি দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত ছিল, সেই নিমিত্ত নগরের নাম 'গিরিব্রজ'। গিরিব্রজ জরাসন্ধরাজার রাজধানী ছিল।

জিনপ্রভসূরি প্রণীত 'বিবিধ তীর্থকল্প' ও 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে—মগধের রাজধানী বিম্বিসারের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত 'কুশাগ্রপুর' নামে পরিচিত ছিল। হিউয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—এই অঞ্চলে ঈষৎ গোল, সুগন্ধযুক্ত কুশতৃণ প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত, সেইজন্য এই স্থান কুশাগ্রপুর নামে খ্যাত। নগরের প্রত্যেক গৃহের ছাদ কুশতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইত।

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন এইস্থানে রাজার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে অর্থে নগরের নাম 'রাজগৃহ'। সুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"রাজগেহে তি এবং নামক নগরং। তং হি মন্ধাতা-মহাগোবিন্দ-আদি পরিগোহিত্বা রাজগেহা তি উচ্চতি।"

ধর্ম্মপাল কিন্তু বলিয়াছেন, এই নগরে অনেক সামন্ত রাজন্য-বর্গকে বন্দী করিয়া রাখা হইত, সেই জন্য ইহার নাম 'রাজগৃহ'। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে—ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ রাজাকে বধ করিয়া রাজগৃহের কারাগার হইতে বহু রাজন্যবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

জিন প্রভসূরির মতে রাজগৃহ প্রাচীনকালে 'ক্ষিতি প্রতিষ্ঠ,' 'চাণকপুর' 'ঋষভপুর' ও 'কুশাগ্রপুর' নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে এই নগরের নাম 'বসুমতী' এবং মহাভারতে বনপর্ব্বে 'বৃহদ্রথপুর'।

বারাণসী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন জীবন্ত নগর রূপে এখনও বিরাজ করিতেছে। একই স্থানে স্মরণাতীত কাল হইতে পুনঃ পুনঃ গঠিত হইয়া আর্য্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। রাজগৃহও অতি প্রাচীন কাল হইতে সুপরিচিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্ররূপে খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্যাত ছিল। ওয়াটার্স সাহেব লিখিয়াছেন— "The old city called Rajgriha is represented as a very ancient one, the third in the history of the world" (Travels of Hiuen Sang Page—162) রাজগৃহ নামে প্রাচীন সহরটী পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয় প্রাচীন নগর।

রাজগৃহ ও নালন্দার ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমানে ভূগর্ভ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। পাটনা জিলার বিহার-সরিফ মহকুমার মধ্যে বিহার-সরিফ শহরের অদূরে রাজগৃহ ও নালন্দা অবস্থিত। ই, আই, রেলপথে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন কলিকাতা হইতে ৩১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বক্তিয়ার-পুর ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোং দ্বারা নির্ম্মিত ও পরিচালিত একটি ছোট রেলপথ ৩২ মাইল গিয়া রাজগৃহের পঞ্চশৈলমালার সন্নিকটে শেষ হইয়াছে। বিহার-সরিফ সহর হইতে নওয়াদা পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে, তাহারই উপর রাজগির ও পাবাপুরি অবস্থিত। রাজগিরের উষ্ণপ্রস্রবণ ও ব্রহ্মকুণ্ডুর নিকটেই সরকারী ডাক বাঙ্গলো অবস্থিত।

রাজগৃহ হইতে ৯ মাইল পাকা রাস্তা দিয়া গো-অশ্ব-মটর যানে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের সমাধিস্থান পাবাপুরীতে উপনীত হওয়া যায়। চারিদিকে পর্ব্বত-বেষ্টিত মনোরম উপত্যকায় হ্রদতুল্য বিস্তৃত নীরপূর্ণ সরোবরমধ্যে শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরের সুরম্য স্মৃতি-সৌধ বিরাজিত। মন্দিরমধ্যে মহাবীরের শ্রীচরণযুগল পূজার জন্য স্থাপিত। সৌধে চারিদিকে শতসহস্র শ্বেত কমল প্রস্ফুটিত হইয়া পবিত্র স্থানটির অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। হ্রদতীর হইতে বারি রাশির উপর দিয়া দুইশত ফীট লম্বা একটি বাধান সেতু স্মৃতিসৌধে যাইবার জন্য

নির্ম্মিত। উৎসবরাত্রে সেতু ও সৌধ দীপমালায় সজ্জিত হয়।

প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পাবাপুরীতে লক্ষাধিক জৈন তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। রাজগৃহে ও পাবাপুরীতে ত্রিশ সহস্র যাত্রী থাকিবার বড় বড় সুরম্য ধর্ম্মশালা ধনী জৈন বনিকরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ সংখ্যায় অল্প এবং তাঁহারা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা অতি অল্প পাইয়াছেন, তথাপি আবুপাহাড়ে 'বিমল' সা ও দিলওয়ার মন্দিরের মার্ব্বেলের সুক্ষ্ম কার্য্য, পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির, গিনার পাহাড়ের বস্তি, ইলোরার গুহার শিল্প ও ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছেন। আমরা যখন ১৯৩১ সালের ২রা নভেম্বর পাবাপুরি যাই, তখন স্বর্গীয় পুরাণচাঁদ নাহার ও তদীয় জামাতা রায় বাহাদুর লছমীচাঁদ সুচন্তিয়া এই স্থানের ন্যাসরক্ষক ছিলেন। পুরাণচাঁদ নাহার মহাশয় রাজগৃহে একটী আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং লছমীচাঁদ বাবু বিহার সরিফের বাসিন্দা।

রাজগৃহের পঞ্চগিরি

মহাভারতের সভাপর্ব্বে পঞ্চগিরির নাম প্রথমে বৈহার, বরাহ, ঋষভ (ঋষিগিরি) শুভ ও চৈত্যক—পরে এই পাঁচ পর্ব্বতের নাম পাণ্ডব, বিপুল, বরাহ, চৈত্যক ও মাতঙ্গ বলা হইয়াছে। পালি ইসিগিরি-সুত্তে পাঁচটি পাহাড়ের

নাম—বৈহার, পাণ্ডব, গৃধ্রকূট, বিপুল ও ঋষিগিরি। ফা হিয়ানের মতে পঞ্চ শৈলের নাম বিপুল, বৈভার, রত্ন, সোনা ও উদয়গিরি।

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ বৈহার ও বিপুল গিরির মধ্যে অবস্থিত, দক্ষিণ দ্বার সোনা-গিরি ও উদয়-গিরির মধ্যে, এবং পূর্ব্ব তোরণ সোনাগিরি ও রত্নগিরির মধ্যে। উত্তর তোরণের পশ্চিমে বৈহার গিরি এবং পূর্ব্বে বিপুল গিরি। দক্ষিণদ্বারের পশ্চিমে সোনাগিরি ও পূর্ব্বে উদয়গিরি অবস্থিত। পূর্ব্ব দ্বারের উত্তরে রত্নগিরি, ছোটগিরি ও শৈল-গিরি এবং দক্ষিণে সোনা ও উদয় গিরি। বৈহার গিরি পশ্চিম দ্বারের উত্তরে এবং সোনাগিরি দক্ষিণে অবস্থিত।

স্যার জন মার্শাল মনে করেন, গৃধ্রকূট পর্ব্বতই ছোটগিরি, জেনারেল কানিংহ্যাম সাহেবের মতে গৃধ্রকূট ও শৈলগিরি এক। পালি মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থে ঋষিগিলি (ঋষিগিরি) হইতে আরম্ভ করিয়া বৈহার, পাণ্ডব, বিপুল ও গৃধ্রকূট পর পর এই পঞ্চগিরির নামোল্লেখ আছে।

মহাবস্তু গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণি গুহা বৈহার-গিরির উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বলা আছে। ফা হিয়ান এই পাহাড়ের উত্তর দিকেই সপ্তপর্ণি গুহা দেখিয়াছিলেন। হিউয়েন সাংও পি-পু-লো (বিপুল) গিরির উত্তর পার্শ্বে ঐ গুহা দেখিয়াছিলেন। এই গিরির পাদদেশে উষ্ণপ্রস্রবণগুলি অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমানেও রাজগিরের উষ্ণপ্রস্রবণগুলি বৈহার পর্ব্বতেই

আছে। বিপুলগিরির প্রস্রবণগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয়।

ডি, এন, সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে পাণ্ডবগিরিই রত্নগিরি। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে গৃধ্রকূটকে বিপুলগিরির পার্শ্বে বলা হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান যখন রাজগৃহে আগমন করেন তখন অন্তর নগর গিরিব্রজ প্রায় জনশূন্য। তিনি সেই স্থানের দুইজন ভিক্ষুকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া পাহাড়কে দক্ষিণ-পূর্ব্বে রাখিয়া পনর লী (২½ মাইল) যাইবার পর গৃধ্রকূটের পাদদেশে উপস্থিত হন। শৃঙ্গের তলদেশে উত্তর দিকে একটি গুহা দর্শন করেন, সেখানে বুদ্ধ তপস্যা করিতেন; তদ্দর্শনে ফা-হিয়ান অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছিলেন (Legges Fa-Hien, P82)। এই গুহার উত্তর-পশ্চিমে আনন্দের গুহা যেখানে শকুনির ছদ্মবেশে মার ঝাপটা মারিয়া ভয় দেখাইত। তারপর তিনি অনেকগুলি গুহা দেখিয়াছিলেন, যেখানে শতাধিক অর্হৎ বাস করিতেন। বুদ্ধদেবের গুহার সম্মুখে পাহাড়ের গাত্র কতক অংশ সমতল, যেখানে বুদ্ধ পাদচারণ করিতেন; পূর্ব্ব-পশ্চিমে সেই স্থানে এক বিরাট প্রস্থর-খণ্ড তখনও রক্ষিত ছিল, বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার জন্য দেবদত্ত সেই পাথর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাংও গিরিব্রজ হইতে আড়াই মাইল উত্তর পূর্ব্বে গিয়া গৃধ্রকূটে উপনিত হন। উত্তরের পাহাড়টি বৈহারগিরি। তিনি লিখিয়াছেন গৃধ্রকূট পূর্ব্ব-পশ্চিমে

লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে অপরিসর। পাহাড়টি অতি উচ্চ। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে গৃধ্রকূট বিপুলগিরি সংলগ্ন। উতুম্বরিক স্থক্তে বলা হইয়াছে যে 'সুমগধ' সরোবর তীরে ময়ূরগণের খাদ্যখাবার ক্ষেত্র গৃধ্রকূটেরই সন্নিকটে অবস্থিত। উতুম্বরিকা দেবীর ভূসম্পত্তি এই স্থান হইতে বেশীদূর নহে। সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে গৃধ্রকূটের নিকটেই সর্পিনী নদী (বর্ত্তমান পঞ্চানা নদী) প্রবাহিত। দীর্ঘ-নিকায় গ্রন্থে অজাতশত্রু জিবকের আম্রকাননে নিশাযোগে ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ-মানসে উপস্থিত হইবার কথা উল্লেখ আছে। বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৃধ্রকূট ও নগর-প্রাচীরের মধ্যস্থানে ঐ আম্রবন অবস্থিত ছিল। মজ্ঝিম নিকায়ে বর্ণিত আছে, কালশিলা গিরি ঋষিগিরি-পার্শ্বে এবং গৃধকূটের সন্নিকটে। বুদ্ধদেব গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে কালশিলায় অবস্থিত ভিক্ষুগণের গতিবিধি অবলোকন করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রত্নগিরির এক অংশ গৃধ্রকূট। গুরুদাস সরকার লিখিয়াছেন—"কালক্রমে গৃধ্রকূটের সংস্থান বিষয়ে লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল।"

ফা-হিয়ান ও হিউয়েন সাং উভয়েই গৃধ্রকূটে আরোহণ করিয়াছিলেন। যেখানে রত্নগিরি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাঁকিয়াছে সেইস্থান হইতে ফা-হিয়ান গৃধ্রকূটে উঠিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাং বিপরীত দিক হইতে আসিয়া এই পথেই গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করেন। এখনও সেই পথ দিয়া গৃধ্রকূটে উঠিতে হয়।

অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের গৃধ্রকূট দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার দত্ত পি, এচ্, ডি, মহাশয় আমায় লিখিয়াছেন—

"১৯০৮ সালে আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সরল কুমার ও জ্যোঠামহাশয়ের সঙ্গে মাসখানেক রাজগিরে ছিলাম। তখন জ্যাঠামহাশয় পালি গ্রন্থ পড়িতেন ও হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ বৃতান্ত সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। বহু পালি গ্রন্থে আছে বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূটএ বিহার করিতেন। গৃধ্রকূট ঠিক কোথায় তাহা কানিংহাম সাহেবের এন্সিয়াণ্ট জিয়োগ্রাফিতে নাই। রাজগৃহের পাঁচ ছয় মাইল দূরে, এই পর্য্যন্ত জানা ছিল। জ্যাঠামহাশয় স্থানীয় পাণ্ডা ও আরো অনেককে ডাকাইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, উহ রাজগৃহ হইতে ছয় মাইল দূরে এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া কতক পদব্রজে কতকটা গো-শকটে যাওয়া যায়। ব্লক সাহেব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যান্য যে সব অফিসার রাজগিরিতে আসিয়াছিলেন, কেহই সেখানে যান নাই। ঠিক কোন পাহাড়টি গৃধ্রকূট সেইজন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদবধি প্রকাশিত কোন গ্রন্থে নাই।

জ্যাঠামহাশয় একদিন প্রাতঃকালে স্থান-নির্দ্দেশ-কল্পে এক পাণ্ডা ঠাকুরকে লইয়া এক গরুর গাড়িতে যাত্রা করেন

ও গৃধ্রকূট পর্ব্বতে হিউয়েন সাংএর বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিয়া আসেন। ৬ মাইল দূরে যে পাহাড়গুলি আছে তাহার একটি মাত্র পাহাড়ে প্রকাণ্ড এক গুহা আছে। হিউয়েন সাংএর বর্ণনায় আছে তিনি গৃধ্রকূটের গুহায় বুদ্ধদেবের পূজা দিয়াছিলেন। এই পাহাড়ের শৃঙ্গটি গৃধ্রের মতন দেখিতে। ঐ পাহাড়ের পবিত্রতা ও সেখানে পূজা দেওয়ার প্রথা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এখনও প্রচলিত আছে, জ্যাঠামশায় ঐ গুহায় পূজার ফুল ও প্রদীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।"

রাজগৃহ নানাধর্ম্মের পীঠস্থান

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলন-স্থান রাজগৃহ। প্রাক্-মহাভারতীয় যুগের রাজগৃহে প্রচলিত ধর্ম্মের বিষয় অনেক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার "গয়া ও বুদ্ধগয়া" ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছেন—রাজগৃহের আদিম ধর্ম্ম যক্ষ ও নাগপূজায় নিবদ্ধ ছিল। বুদ্ধঘোষ সরত্থাপ্প-কাসিনী গ্রন্থে বৈহারগিরির অভ্যন্তরে অবস্থিত মনোরম নাগলোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে গিরিব্রজ নগরে মণিনাগ এবং স্বস্তিকানাগের আবাসদ্বয়ের উল্লেখ আছে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ যে মণিয়ারমঠ গুহা আবিষ্কার করিয়াছে তাহাই মণিনাগের আবাসস্থল বা মন্দির।

স্যার জন মার্শাল তাঁহার প্রণীত "রাজগৃহ এণ্ড ইট রিমেন্স" পুস্তকে মণিয়ারমঠের ও সেস্থানে প্রাপ্ত অর্দ্ধো ত্তোলিত মূর্ত্তিসহ একটি প্রস্তর-ফলকের বর্ণনা দিয়াছেন। ফলকটিতে নাগ ও নাগিনীর মূর্ত্তি ও মণিনাগের নাম উৎকীর্ণ আছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার লিখিয়াছেন—নাগদেবতা-গণের মহিমা ও প্রভাব বুদ্ধদেবের সময়ে, এমন কি পরেও রাজগীরে বর্ত্তমান ছিল। নাগরাজ মণিভদ্রের মন্দির—যাহা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ মণিয়ারমঠ নামে অভিহিত করে, তাহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজগৃহে প্রাপ্ত দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি নালন্দার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তাহাদের মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকের উপর সাপের ফণা। নাগরাজ মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) বুদ্ধদেবের সমাধি অবস্থায় ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বৃষ্টি ও সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিল্পী সেইজন্য বুদ্ধের মস্তকের উপর সর্পের ফণা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। মূর্ত্তিটি গৃধ্রকূট পর্ব্বতে পাওয়া গিয়াছে।

মণিয়ারমঠের চারিপার্শ্বে রাজগৃহের অভ্যন্তর-নগর-মধ্য হইতে আবিষ্কৃত কয়েকটি শিল্প-সম্ভার নাগপূজা-প্রচলনের সত্যতা সপ্রমাণ করে। যেমন—(১) পুষ্পমাল্যবেষ্টিত লিঙ্গ, (২) বাণাসুর মূর্ত্তি, (৩) নাগদেবতার মূর্ত্তি—মাথার উপর পাঁচটি সাপের ফণা বিস্তৃত, বাম হস্ত শঙ্খের মতন কোন দ্রব্য তুলিতে প্রসারিত এবং দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে

উত্তোলিত। (৪) মস্তকোপরি বহু সাপের ফণাযুক্ত নাগ-মূর্ত্তি। বাম হস্তে জলপাত্র এবং দক্ষিণ হস্ত বরদা মুদ্রায় উর্দ্ধে উত্তোলিত। (৫) তিন ফণাযুক্ত শিরস্ত্রাণ সহিত একটি নাগ-মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলিত এবং বাম হস্ত নিম্নে লম্বিত। (৬) গণেশ মূর্ত্তি। (৭) দণ্ডায়মান নাগ-মূর্ত্তি, মস্তকোপরি তিনটি বিস্তারিত ফণা। (৮) নাগ-মূর্ত্তি, অপর মূর্ত্তিটিরই মতন। (৯) নাগ-মূর্ত্তি, একই পরিকল্পনার। (১০) নৃত্যরত শিবমূর্ত্তি, ছয়টি হস্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত এবং গলদেশ ও মস্তকে সর্প বেষ্টন করিয়া আছে। (১১) রাজগৃহ নগর মধ্যে প্রাপ্ত নাগ-মূর্ত্তি। একদিকে বিস্তৃত ফণা আটটি বাসুকীর মূর্ত্তি খোদিত, অপর দিকে দুইটী দণ্ডায়মান মানব-মূর্ত্তি। তাহার উপর অতি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত শিলালিপি।

রাজগৃহে যক্ষপূজার কথা পালি গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়। শিবক যক্ষ সিতবন-শ্মশানের রক্ষক ছিলেন। শিবক অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নানা প্রকার বিভূতি দেখাইতে পারিত। ইন্দ্রকূট পর্ব্বতে ইন্দ্রক ও গৃধ্রকূট পর্ব্বতে শক্র যক্ষের নিবাস ছিল। মগধের মণিমালা চৈত্যে মণিভদ্র যক্ষের পূজা হইত। বিপুলগিরিতে কুম্ভীর যক্ষের আলয় ছিল।

পূর্ব্বে বৃক্ষাদিতে অধিষ্ঠিত দেবতার পূজা হইত। তাহারও বহু দৃষ্টান্ত রাজগৃহে দেখা যায়। বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ হিন্দুর

পক্ষে চিরদিন পবিত্র। রাজগৃহে 'সুপ্রতিষ্ঠিত' ও 'ভূপ্রতিষ্ঠ' নামে দুইটি মহাকায় বট লোকচক্ষে শ্রদ্ধার বস্তু ছিল।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, দীর্ঘতম, গৌতম, কুক্ষিবৎ আদি বেদ-প্রসিদ্ধ ঋষিগণ গিরিব্রজের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থান করিতেন। পালি সুমঙ্গলবিলাসিনীর বর্ণনায় মহাগোবিন্দ ও মন্ধাতা ঋষি রাজগৃহে বাস করিতেন। ইসিগিলি সুত্তের মতে ঋষিগিলি পর্ব্বতই ঋষিগিরি নামে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা মুনি-ঋষিগণকে এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখিত, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কেহ দেখিতে পাইত না। এজন্য তাহারা ভাবিত এই গিরিতে ঋষিরা চিরনিবাসী, অর্থাৎ ঋষিগিরি ঋষিগণের চির-সমাধির স্থান। উক্ত সুত্তে বর্ণিত আছে যে, ঋষিগিরিতে পাঁচশত ঋষি বাস করিতেন। ঋষিগণের নামের তালিকাও পাওয়া যায়।

রাজগৃহে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বুদ্ধের নির্ব্বাণের বহু বৎসর পর পর্য্যন্ত ছিল। নগরের চারিপার্শ্বে ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে 'একনালা' নামে একটি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পল্লী ছিল। নগরের পূর্ব্ব-প্রান্তে 'অম্রখণ্ড' ব্রাহ্মণ পল্লী অবস্থিত। উতুম্বরিকা দেবীর উদ্যানে ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকদের সাময়িক বিশ্রামস্থল ছিল। সুমগধ পুষ্করিণী ও সর্পিণী (পঞ্চানা) নদীর তীরে আর একটি আরাম অর্থাৎ যাযাবরগণের বিশ্রামাগার ছিল। সেই স্থানে অন্নভার

সকুল-উদায়ী প্রভৃতি বিখ্যাত পরিব্রাজক মাঝে মাঝে আগমন করিতেন।

স্থাণুবৎ মগধের একটি সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-পল্লী। রাজা বিম্বিসার কূটদন্ত নামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে এই পল্লী দান করিয়াছিলেন, তিনি এই জনপদে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। এই ব্রহ্মোত্তরের আয়ে বৈদিক মহাশালা চলিত। প্রতি বৎসর এখানে একটি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, শত শত গো, মহিষ, ছাগ, মেষ বলি পড়িত। রাজগৃহের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ গোত্রের ছিল। কেহ কেহ অগ্নিহোত্রী ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ সংযমী ও যোগাভ্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ কেহ শান্ত-প্রকৃতির জটাধারী সাধু, আর কেহ কেহ কোপন-স্বভাব।

হিউয়েন সাং, পরিত্যক্ত রাজধানী রাজগৃহে এক সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পর মগধের রাজা রাজগৃহ ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন। সংযুক্ত-নিকায়ে ব্রাহ্মণ পরিব্রাজিকা সূচিমুখীর খ্যাতির কথা উল্লেখ আছে। পূরণ কাশ্যপ, মস্করী ঘোশালা, ককুদ কাত্যায়ণ, অজিত কেশ কম্বলী, সঞ্জয় বেলাস্থি পুত্র এবং নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র রাজগৃহে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

সঞ্জয় নামে এক পরিব্রাজক রাজগৃহে পাঁচশত শিষ্যসহ

বাস করিতেন। সে যুগে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। বুদ্ধের বিখ্যাত সাক্ষাত শিষ্যযুগল শারিপুত্র ও মৌদ্গলাায়ন পূর্ব্বে এই সঞ্জয়ের দলেই ছিলেন। মহাবস্তু গ্রন্থের বর্ণনায় সঞ্জয় ছিলেন সংশয়বাদী।

জৈন-ধর্মাচার্য্যগণের প্রধান লীলাস্থান ছিল এই রাজগৃহ এবং রাজগৃহের সহরতলী নালন্দা গ্রামে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর তাঁহার তপস্যার দ্বিতীয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। এই রাজগৃহ ও নালন্দায় তিনি তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম সমর্থক ধনী ও গৃহী বিজয়, আনন্দ, সুদর্শন, রাপুল শিষ্যচতুষ্টয়কে লাভ করিয়াছিলেন। নালন্দার নিকটবর্ত্তী কোন্নর্গা এবং বালেক গ্রাম দুইটাই মহাবীরের ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম ও প্রধান স্থান। আজাবিক দলের নেতা গোশাল রাজগৃহে মহাবীরকে প্রথম দেখিয়াছিলেন। মহাবীর রাজগৃহে ও নালন্দায় চৌদ্দবর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর সুব্রত রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। রাজগৃহেই মহাবীরের বারজন অগ্রশিষ্যের মধ্যে এগারজনের তিরোধান হইয়াছিল।

ঋষিগিরের "কালশিলা" গুহায় বহু নিগ্রন্থ বা জৈন তাপসগণ যোগ ও কৃচ্ছ্রসাধনে রত থাকিতেন। এই কালশিলা গুহা সম্ভবতঃ জৈন উপাসক দম্পাঙ্গ সূত্রের বর্ণিত গুণশিলা চৈত্য।

হিউয়েন সাং বৈহারগিরিতে বহু দিগম্বর জৈন সাধককে উদয়-অস্ত সূর্য্যের দিকে চক্ষুর্দ্বয় নিবদ্ধ রাখিয়া তপস্যা করিতে

দেখিয়াছিলেন। জৈনগণ রাজগৃহের প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গে ছোট-বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলি আধুনিক। এখনও বহু জৈন-তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর সেই সকল মন্দির ও তীর্থঙ্করমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান। কুষাণ-যুগে নির্ম্মিত এক জিনমূর্ত্তির পাদপীঠে বিপুলগিরি ও রাজা শ্রেণিকের (বিম্বিসারের) নাম উৎকীর্ণ আছে। বিপুলগিরির শীর্ষভাগে সুব্রত মুনির মন্দির ও এই পর্ব্বতেই মহাবীরের মন্দির এখনও অবস্থিত।

মহাবীরের তিরোধান-স্থান পাবাপুরী রাজগৃহ হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে। মজঝিম-নিকায়ে বর্ণিত আছে—রাজকুমার অভয় (বিম্বিসারের পুত্র) জৈনধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন। বিবিধ-তীর্থ-কল্পে বিম্বিসার-তনয় অভয়, হল্ল, বিহল্ল এবং নন্দিসেন জৈনধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। নালন্দার প্রবারিক আম্রকাননে মহাবীরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। উপালি ও লেপ নামক গৃহস্থগণ জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

মহাবীর ও বুদ্ধ সমসাময়িক। বুদ্ধের আগমনে ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে রাজগৃহ পবিত্র হয়। রাজগৃহেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার ও প্রসার হয়, যদিও বুদ্ধ সারনাথে পঞ্চশিষ্যের নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রথমেই সিদ্ধার্থ রাজগৃহে আগমন করেন।

রাজগৃহেই বুদ্ধ প্রথম ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর দেহকান্তি ও বিনম্রভাব দেখিয়া মগধরাজ বিম্বিসার মুগ্ধ হন। রাজগৃহ ও উরুবেলার (বুদ্ধগয়ার) মধ্যপথে বুদ্ধ 'অবাড় কালাম' ও 'রুদ্র রামপুত্রের' নিকট যোগ শিক্ষা করেন। এই মগধরাজ্যেই বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার সার্থক হয়। এক হাজার শিষ্যসহ জটিলাদের তিনজন নায়ক এই মগধেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই বুদ্ধ প্রথমে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করেন এবং যষ্টিবনে অবস্থান করেন। সশিষ্য বুদ্ধের আগমনে, তাঁহাদের নম্র ও অহিংসক ব্যবহারে রাজা বিম্বিসার ও নগরবাসিগণ আকৃষ্ট হন।

রাজগৃহেই বুদ্ধ প্রথম রাজা বিম্বিসারের রাজকীয় সহায়তা লাভ করেন। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বেণুবনটি বুদ্ধকে দান করেন। এইস্থানে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথম বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন এইস্থানেই দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। বেণুবনে স্থানাভাব হইলে রাজগৃহের পঞ্চগিরির গুহায় শত শত ভিক্ষু বাস করিতেন। এইখানেই এক ধনশ্রেষ্ঠী বুদ্ধভক্ত হন এবং বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিয়া অল্পসময় মধ্যেই ষাটটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজগৃহেই বুদ্ধদেব মহাকাশ্যপকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

বেণুবন ও গৃধ্রকূট, এই দুই স্থানে বুদ্ধ সাধারণতঃ বাস

করিতেন। জীবক বুদ্ধের সমসাময়িক ও রাজ-চিকিৎসক ছিলেন। বিম্বিসারের পুত্র অভয় তাঁহার বন্ধু জীবককে সুদূর তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। জীবক চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রাজাদেশে বুদ্ধের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। জীবক বুদ্ধের ভক্ত ও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগী হন। তিনি তাঁহার আম্রকানন সশিষ্য বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধঘোষের মতে জীবকের আম্রবন ও বিহার রাজগৃহের নগর-প্রাচীর ও গৃধ্রকূটের সানুদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়ান যখন রাজগৃহে আগমন করেন, তখন পুরাতন রাজগৃহ ধ্বংসপ্রায়। তিনি এই আম্ররনকে 'আম্রপালীর আরাম' বলিয়াছিলেন। আম্রপালী ছিলেন বৈশালী-নগরবাসিনী এবং তাঁহার আরাম ছিল বৈশালীতে।

বুদ্ধের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ধনী ব্রাহ্মণের বংশধর, পিণ্ডাল ভরদ্বাজ রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্রকথী কুমার কাশ্যপ রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশালীতে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের স্থাপনের পর, রাজগৃহে বিম্বিসারের রাণী ক্ষেমা এই সঙ্ঘে যোগদান করেন। রাজগৃহে বহু নারী ভিক্ষুণী হন।

এই রাজগৃহে শ্রাবস্তী-নগরের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠি অনাথ পিণ্ডদ বুদ্ধের দর্শনলাভ করেন; এবং কোশলের রাজ-

ধানীতে আগমনের জন্য বুদ্ধকে আহ্বান করেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর বুদ্ধের পিতা কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন রাজগৃহেই বুদ্ধের নিকট প্রথম দূত পাঠাইয়াছিলেন।

খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহ মহানগরের রাজপথ বুদ্ধের চরণ-স্পর্শে ধন্য হয়, তাঁহার স্তবগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইত। বাঙ্গলার বৌদ্ধ কবি সর্ব্বানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে—

শান্তি প্রেম বাক্য আজ, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মাঝ,
সর্ব্ব জীবে করে উচ্চারণ।
কটু ভাষা নাহি মুখে, সকলে পরম সুখে,
বুদ্ধগুণ করিল কীর্ত্তন॥

ফিনিশিয়া. মিসর ও সেবা নগরীর ন্যায় রাজগীর পরম ঐশর্য্য-শালী ও জনাকীর্ণ নগর ছিল। তন্নিমিত্ত ভগিনী নিবেদিতা রাজগৃহকে ভারতের ব্যাবিলন বলিয়া গিয়াছেন।

গৃধ্রকূট পর্ব্বত বুদ্ধের অতি প্রিয়স্থান। গৃধ্রকূটে অবস্থান কালে বুদ্ধ কয়েকটি লোক-বিশ্রুত উপদেশ দেন এবং উপোসথ (বৌদ্ধগণের মধ্যে পাপ-স্বীকার ও আত্মশুদ্ধি করার পদ্ধতি) প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। রাজগৃহ ষকবগী ভিক্ষু-গণের তিনটি প্রধান কর্ম্মস্থানের মধ্যে অন্যতম। এই গৃধ্রকূটে অবস্থান-কালে দেবদত্ত ও শ্রীগুপ্ত বুদ্ধের জীবননাশের চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হন। রাজগৃহ হইতে বুদ্ধ তাঁহার নশ্বর দেহত্যাগের জন্য কুশীনগরে যাত্রা করেন।

বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের পর তাঁহার আটজন অনুরাগী ক্ষত্রিয়কুল বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ আটভাগে বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে লইয়া যান। অজাতশত্রু এক অংশ রাজগৃহে লইয়া যান, এবং তাহা রাজগৃহেই স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটি মনোরম স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

সম্রাট অশোক সেই স্তূপটির সংস্কার করেন এবং তৎপার্শে একটি পঞ্চাশ ফিট উচ্চ সিংহশিরযুক্ত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। সেই স্তূপ ও স্তম্ভ হিউয়েন সাং দেখিয়াছিলেন। উহার কোন চিহ্ন এখন নাই। কালের ও মানবের পীড়নে রাজগৃহের সৌধাবলী সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজগৃহে খৃঃ-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

এই রাজগৃহেই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি (মহাধর্ম্মসভা) আহূত হয়। কথিত আছে, রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারে বৈভারগিরির পার্শে রাজা অজাতশত্রুর দ্বারা সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মহাসংগীতিতে স্থবির মহাকাশ্যপ সভাপতিত্ব করেন। বৈভারগিরি পশ্চিম অংশে যে দুইটি গুহা বর্ত্তমান তাহার মধ্যে ছোট গুহাটি পিপ্পলাগুহা—এরূপ অনেক পণ্ডিতের মত। কিন্তু প্রাচীন বিনয়পিটকের বিবরণে মহাসংগীতি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে সপ্তপর্ণী গুহা ও রাজা অজাতশত্রুর উল্লেখ নাই। তবে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে রাজগৃহে

আহূত প্রথম সংগীতিতেই বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও বিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল।

ফা-হিয়ান যখন রাজগীরে আগমন করেন তখন তিনি করণ্ড বেণুবনে একটি পুরাতন বিহার দেখিয়াছিলেন। সেখানে এক ভিক্ষু নিত্য বিহার ও প্রাঙ্গণ ধৌত করিতেন। কিন্তু হিউয়েন সাং আর কোন ভিক্ষুকে সেই বিহারে দেখিতে পান নাই।

পাল রাজাদের পৃষ্ঠোপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার পুনরায় বৃদ্ধি পায়। তখনই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির চরম অবস্থায় উপনীত হয়। হিউয়েন সাং নালন্দার সেই গৌরবময় অবস্থা দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধপত্নী যশোধরা শেষজীবনে রাজগৃহে বাস করিতেন এবং এই স্থানেই ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিল্প ও স্থাপত্য

রাজগৃহের পুরাকালের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন বর্ত্তমানে অতি বিরল ও অস্পষ্ট। তাহার স্বরূপ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজগৃহের স্থাপত্য ও শিল্পের প্রধান বিকাশ নগর নির্ম্মাণে দেখা যায়। ইহার অন্তর ও বহির্নগর সুপরিলক্ষিত ও সুদৃঢ় ছিল। যদিও পঞ্চগিরি নগরের বাহিরের প্রাচীর রক্ষা বেষ্টনীর ন্যায় পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান ও পথ দুর্গম করিয়া অবস্থিত, তথাপি নগরটি পর

পর দুই প্রস্ত সুদৃঢ় পাথরের প্রচীরের দ্বারা বেষ্টিত ও রক্ষিত ছিল। এই নগরের ৯৬টি প্রবেশদ্বার। বুদ্ধঘোষ তাঁহার সুমঙ্গল-বিলাসিনী গ্রন্থে এই ৯৬ দ্বারের মধ্যে ৩২টি বড় ও ৬৪টি ছোট তোরণ বলিয়াছেন। বাহিরের নগরে আবার ৪টি প্রধান তোরণ ছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহাভারতে উল্লিখিত আছে—বৈহার, বরাহ, ঋষভ, ঋষি ও শুভচৈত্যগিরি নামে পঞ্চগিরির দ্বারা গিরিব্রজ সুরক্ষিত ছিল। স্নাতক-ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন বীরত্রয় দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া চৈত্যগিরি (বিপুলগিরি) উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দক্ষিণ-নগর-তোরণের মধ্যদিয়া জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। "জরাসন্ধের বৈঠক" নামে একটি সৌধ এখনও সেইস্থানে বর্ত্তমান। ফার্গুসানের মতে ইট-পাথরের সৌধ-স্থাপত্যের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন এই বৈঠক। কিন্তু ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ফার্গুসানের মতের প্রামানিকতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—বৈহার গিরির পার্শ্বে অবস্থিত উষ্ণপ্রস্রবণে উঠিবার পথে বাম পার্শ্বে 'জরাসন্ধের বৈঠক।' রাজগিরের গির্জ্জক পাহাড়ের অপরাংশে এইরূপ আর একটি ইটের নির্ম্মিত বৈঠক আছে। ডাঃ বড়ুয়া বলেন—আপাত দৃষ্টিতে শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিবার মঞ্চ (ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ওয়াচ্ টাউয়ার') এই সমস্ত বৈঠক।

এই পাহাড়ের একটি স্থান পাণ্ডারা জরাসন্ধ ও ভীমের

মল্লভূমি বলিয়া দেখান। কঠিন পাহাড়ের পৃষ্ঠে নরম মাটির স্থানটি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে মল্লভূমির প্রতীক।

রাজগৃহের অন্তর ও বহির্নগরের রাজপ্রাসাদদ্বয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; রাজপ্রাসাদদ্বয় দ্বিতল ছিল। নূতন রাজগৃহের রাজপ্রাসাদের কিছু ভগ্নাংশ এখনও দেখা যায়। রাজগৃহের বহির্নগরের উত্তরাংশে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ সৌধের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অজাতশত্রুর দ্বারা নির্ম্মিত। রাজগৃহে জনৈক শ্রেষ্ঠী নির্ম্মিত সপ্ততল সৌধের উল্লেখ হিউয়েন সাং করিয়াছেন। এই সৌধ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং ইহার ছোট বড় কতকগুলি তোরণ ও প্রবেশদ্বার ছিল।

বিম্বিসার রাজার প্রমোদ-উদ্যান বেণুবন অতি মনোরম, উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এবং উহাতে সুদৃশ্য গোপুরম (দক্ষিণ-ভারতের বিশাল বিশাল মন্দিরের গগনচুম্বি দ্বারের অনুরূপ দ্বার) সংযোজিত ছিল। বিম্বিসার এই উদ্যানই বুদ্ধের বাসের জন্য প্রদান করেন। পরে এই বেণু-বনেই একটি প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মিত হয়।

রাজগৃহের স্থাপত্য-কৌশলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, উহার তিন মাইলব্যাপী পাথরের সুদৃঢ় প্রাচীর। এই বিরাট প্রাচীর পাহাড়ের গাত্রে ও উপরে বিসর্পিত হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাচীর প্রস্থে প্রায় ১০।১২ ফিট, মধ্যে মধ্যে বুরুজ দ্বারা সমর্থিত। স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও

বিদ্যমান। এ যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থপতিগণ এই স্থাপত্য-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রাচীরের স্থাপত্য গ্রীক সভ্যতারও পূর্ব্বকালের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজগৃহ হইতে নালন্দা যাইবার পথে আম্রযষ্টিকা উদ্যানে রাজা বিম্বিসারের এক মনোরম 'রাজগারা', (বাগান-বাড়ি) ছিল। তাহার গঠন সুন্দর; সুবিন্যস্ত বৃক্ষচ্ছায়া ও সুশীতল জলাধার ছিল, দারুণ নিধাঘেও এইগুলি অতিশয় প্রীতিপ্রদান করিত। উদ্যান ভূমি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উহার প্রবেশদ্বার সুদৃঢ়।

জৈন-সূত্র গ্রন্থে নালন্দাতে ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী লেপার সৌধের কথা উল্লেখ আছে। উহার স্নানাগার অতি সুশ্রী এবং শতাধিক স্তম্ভদ্বারা শোভিত ছিল। এই সব বর্ণনা হইতে প্রাক্-বুদ্ধযুগের স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগেরও স্থাপত্য ও শিল্পের নমুনা বিরল। রাজগৃহে পর্ব্বত ও উপত্যকায় যে অল্প ধ্বংসাবশেষ আছে—তাহা হইতে শিল্প ও কৌশলের যৎসামান্য ধারণা হয় মাত্র।

কলন্দক বেণুবন রাজগৃহের শহরতলীতে অবস্থিত, নগরের জনপূর্ণ অংশ হইতে অধিক দূরে নহে। হিউয়েন সাং বেণুবনে যে সকল সৌধাবলী দেখিয়াছিলেন তাহা ইষ্টক ও প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

রাজগৃহের অধিকাংশ বিহার ও অবাস স্বাভাবিক পর্ব্বত

গুহা। বৈভারগিরির উত্তর পার্শ্বে উষ্ণপ্রস্রবণের পশ্চিমের গুহাটি লম্বা, সর্পাকৃতি, সুন্দর ও সুরম্য। সোণভাণ্ডার গুহা রাজগৃহের গুহাবলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পর্ব্বতগাত্র খোদাই করিয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নির্ম্মিত। তাহা দ্বিতল। সোণভাণ্ডার গুহার পার্শ্বেই আর একটি ক্ষুদ্রকায় গুহা দেখা যায়।

ইন্দশালা গুহাটি বৃহৎ ও স্বাভাবিক ভাবেই পর্ব্বতের বপুর মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। তবে গুহাটি অতি অপ্রসর, অন্ধকারময় ও অসমতল। মানুষের হাতে পড়িয়া অনেকটা সুসংস্কৃত হইয়াছিল। সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে আছে, এই ইন্দশালা গুহার চারিদিকে দেওয়াল, উহাতে জানালা ও দরজা বসান। প্রাচীর গাত্রে চুণের পলস্তারা ও উহাতে লতাপাতা চিত্রিত। মানবের বাসোপযোগী মনোরম করিয়া নির্ম্মিত হইবার পর উহা তথাগতকে দান করা হইয়াছিল।

জীবক তাঁহার আম্রকাননকে একটি রমণীয় বিহারে পরিণত করিয়া বুদ্ধের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। জীবকের উদ্যানভূমি আঠার হাত উচ্চ তাম্রবর্ণের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধের বাসোপযোগী কক্ষ এবং গন্ধকুটি প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ বড়ুয়া তাঁহার ভর্হুৎ পুস্তকে জীবকের আম্রকাননের মণ্ডলমাল বা উপবেশনশালার খোদিত ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। মণ্ডপটির চারিদিক খোলা এবং স্তম্ভশ্রেণীতে সজ্জিত।

মণিয়ার মঠ বর্ত্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগদ্বারা সংরক্ষিত হওয়ায় উহার স্থাপত্য ও শিল্প-ঐশ্বর্য্য বেশ উপলব্ধি হয়। অনেকে বলেন মণিয়ার মঠের গঠন প্রণালী ও পরিকল্পনা রোম ও টিভলী দেশের মন্দির সদৃশ। ডাঃ বিমলা চরণ লাহা বলেন, প্রথম অবস্থায় ইহার এই প্রকার গঠন ছিল না। যে অংশ পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত তাহার তলে নাগ-রাজের উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। তাহার পাদদেশে "১৫৪৭ সম্বৎ খোদিত," এবং ইহার সংলগ্ন একটি কাল প্রস্তর ফলকে দুইটি মানব চরণ উৎকীর্ণ আছে। এই চরণ শলিভদ্র নাগ রাজের জনৈক জৈন মহিলা শিষ্য ১৮৩৭ সম্বতে স্থাপন করিয়াছেন। অধুনা আবিষ্কৃত এক শিলালিপিতে মণি নাগের নাম উৎকীর্ণ আছে।

মণিয়ার মঠের নিকট নির্ম্মলা-কূপ স্থানটি এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত। তাহার নিকটে কয়েকটি বেদী আছে। এইগুলি জরাসন্ধের যজ্ঞশালার যজ্ঞবেদী বলিয়া খ্যাত। বাণ-গঙ্গা যাইবার পথে নাওদার রাস্তার পূর্ব্বদিকে রত্নগিরির নিম্নদেশে জরাসন্ধের রণভূমি ও কারাগার ছিল। এই স্থানে বৃকোদর দৈব ও বাহু বলে পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে হারাইয়া তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন। তৎপরে কারাগার হইতে বহু সামন্ত রাজন্যবর্গকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে মুক্ত করিয়া দেন। এ জাতীয় বর্ণনার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত কাল্পনিক নহে।

বর্ত্তমান জেলা বোর্ডের ডাকবাঙ্গলোর সম্মুখ দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইলে নূতন রাজগীর পার হইয়া পুরাতন রাজগীর যাইতে হয়। এই পথ দিয়া বুদ্ধ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিকে এক ছাগ-শিশু স্কন্ধে লইয়া রাজগৃহের নগর তোরণ অভিমুখে গিয়াছিলেন। রাজপুরীতে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল। বলির জন্য বহু ছাগ যজ্ঞশালায় নীত হইতেছিল। একটি ভগ্নপদ ছাগ-শিশু হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম ছিল। ছাগ মাতা সকরুণ দৃষ্টিতে নিজ শিশুর দিকে পশ্চাতে তাকাইতে তাকাইতে পালকের তাড়নায় চলিতেছিল। করুণায় বুদ্ধের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, তিনি ক্ষুদ্র ছাগ শিশুকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া রাজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধের স্কন্ধে ছাগ শিশু ও পার্শ্বে কাতর ছাগমাতার অপূর্ব্ব এক চিত্র এ যুগের শিল্পাচার্য্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু আঁকিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার তুলিতে বুদ্ধের নয়নে যেমন করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই মূক্ ছাগের চক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে, অহিংসা মন্ত্রের ইহাই উৎস। তাই বৌদ্ধ কবি মতিলাল বড়ুয়া গাহিয়াছেন ঃ—

আয়রে ভাই সবে মিলে বুদ্ধ নামের গুণ গাই।
বুদ্ধনামে খঞ্জ চলে, মৃতদেহে জীবন পাই॥
নিরবাণ সুধার ভাণ্ডার, নিরবাণ শান্তির আগার,
বুদ্ধনামের গুণে চল, সেই নিত্য ধামে যাই॥

তথা নিত্য শান্তি ভাই,
রোগ শোক মনস্তাপ তথা নাহি পাই,
ঐ নাম-তরুর শান্তির ছায়ায় চলরে জীবন জুড়াই॥

এই পথের অনতিদূরে পুণ্যসলিলা 'তপোদা' বা সরস্বতী গিরিপাদ ধৌত করিয়া কুলু কুলু ধ্বনিতে বহিয়া চলিত। একদা সন্ধ্যা বেলায় রাজা বিম্বিসার তপোদা নদীতে স্নান করিতে আসিলে তাঁহার গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যায়। রাত্রিসমাগমে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নগরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হয়। বিম্বিসার পুর-প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বেণুবন-বিহারে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলেন। সে বেণুবন এখনও বিদ্যমান, তবে মহাবিহারের চিহ্ন কিছুই নাই।

গুরুদাস সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"গোদাবরী ও গোমতী নামক সরস্বতীর দুই শাখার সংযোগস্থলে একটি উচ্চ টিপির উপরে রাজগিরের একমাত্র শক্তিমূর্ত্তি অষ্টভূজা জ্বালাদেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে সরস্বতীর পূর্ব্বকূলে স্থানীয় শ্মশানভূমি। এই শ্মশানের অনতিদূরে প্রাচীন রাজগৃহের উত্তরতোরণ অবস্থিত ছিল। ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই বলিয়াছেন যে শ্মশান সাধারণতঃ একই স্থানেই অবস্থিত থাকে। বিপুল ও বৈভার গিরিদ্বয় এইস্থানে পরস্পরের নিতান্ত সান্নিধ্যেই অবস্থিত। বিপুলগিরির পাদমূলে, গনেশ-মন্দিরের নিম্নদেশে পুরাতন রাজগৃহের উত্তর-তোরণ বিদ্যমান ছিল।"

রাজগৃহে বর্ত্তমানে "বস্তুরাজ-কি গড়" বলিয়া যেস্থান পরিচিত তথায় বিম্বিসারের সময় শিতবন অবস্থিত ছিল। শিতবনে পুরবাসীরা মৃতদেহ ফেলিয়া আসিত। বুদ্ধের সময় একান্ত ধ্যান-ধারণায় জন্য এবং সংসারে বৈরাগ্যপ্রাপ্তির আশায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ শিতবনে আসন পাতিতেন। পরে শিতবনে একটি বিহার গড়িয়া উঠে। এই স্থানটি মহাভারতের যুগ হইতে সাধনক্ষেত্ররূপে খ্যাত। বস্তুরাজ, বৃহদ্রথের পিতা এবং জরাসন্ধের পিতামহ। জরাসন্ধের বংশ-ধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিবার পর মগধ হর্য্যক বংশের করতলগত হয়। পুরাণে বিম্বিসার শিশুনাগ-বংশীয়—উল্লিখিত আছে। বিম্বিসার ঐতিহাসিক রাজা, বুদ্ধদেবও ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। স্বদেশ ও স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ সারথির নিকট হইতে অনোমা নদীতটে বিদায় গ্রহন করিবার পর অনুপ্রিয়ার আম্রকুঞ্জে সাত দিন অবস্থান করেন। তারপর গঙ্গার দক্ষিণ অংশে মগধ প্রদেশে আগমন করেন এবং সৎগুরু পাইবার আশায় রাজগৃহে ঋষিগিরিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। রাজা বিম্বিসার প্রাসাদের বাতায়ন হইতে সৌম্য, সুশ্রী, অজানুলম্বিত দিব্যকান্তি যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। গৃহত্যাগী সিদ্ধার্থ এই রাজগৃহ হইতে গয়াভিমুখে যাত্রা করেন।

বৈভারগিরির শিরোদেশে, দক্ষিণপার্শ্বে সোমনাথ ও সিদ্ধনাথ নামে দুইটি শিবলিঙ্গ এক প্রাচীন মন্দিরের

মধ্যে বিদ্যমান। মন্দিরটি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কৃপায় সংরক্ষিত, ইহার পাথরের সরদ্দালের খোদাই কারুকার্য্য প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।[১]

সোনাভাণ্ডার গুহ জৈনগুহা। জৈনাচার্য্য বৈরদেব মুনি এই গুহাতে এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা এক শিলালিপিতে লিখিত আছে। তাহার অক্ষর খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। সোনাভাণ্ডারেব উপরে অনেক পরবর্ত্তী কালের একটি বিষ্ণুমন্দির হিন্দুরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং সোনাভাণ্ডার গুহার পার্শ্বের গুহায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও হনুমানের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

সোনাভাণ্ডার গুহার প্রাচীরগাত্রে দ্বিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি কয়েকটি আছে। তাহা ছাড়া আর কোন মূর্ত্তি সেখানে নাই।

রাজগৃহ প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের পীঠস্থান ও সমৃদ্ধশালী নগর। বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। সারনাথে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেও অধিক সময় রাজগৃহে বাস ও উপদেশ প্রদান করিতেন। এই রাজগৃহের গৌরব প্রায় হাজার বৎসর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার স্থাপত্য ও শিল্প-ঐশ্বর্য্যের চিহ্নও বিরল। রাজগৃহের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ইতিহাস

ও বিবরণ নাই বলিলেই হয়। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে রাজগৃহের পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং রাজগৃহে আগমন করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন বাস করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া হইয়া রাজগৃহে আসেন। তখন রাজগৃহের অবস্থা শোচনীয়। নালন্দা তখন গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছে। তবুও চীনপর্য্যটক লিখিতেছেন :—

"বোধিদ্রুমের (বুদ্ধগয়ার) পূর্ব্বদিকে নৈরঞ্জনা নদী (ফল্গুনদী) পার হইয়া এক গভীর জঙ্গলে একটি স্তূপ দেখিতে পাই। তাহারই উত্তরে বৃহৎ জলাশয় অবস্থিত। পুরাকালে এই স্থানে এক গন্ধহস্তী বাস করিত। সরোবরতীরে একটি স্তূপ অবস্থিত। তৎপার্শ্বে একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত। পুরাকালে কাশ্যপ-বুদ্ধ এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। স্তূপ ও স্তম্ভের পূর্ব্বদিকে কিছু দূর গিয়া মহনদী (মোহানা) পার হইয়া আবার গভীর বনমধ্য দিয়া আসিবার সময় একটি প্রস্তরস্তম্ভ দেখি। স্তম্ভটি সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত। স্থানটি রুদ্ররামপুত্র নামে এক সিদ্ধপুরুষের আবাস স্থান।

বনমধ্যদিয়া একশত 'লি' পূর্ব্বে গমন করিবার পর 'কুক্কুট-পাদ গিরি'তে উপস্থিত হইলাম। গিরির অপর নাম গুরুপাদ। ইহার তিনটি শৃঙ্গ যেন গগন চুম্বন করিতে উদ্যত। ইহা দেখিতে কুক্কুটের মতন। মহা- কাশ্যপের পরিণির্ব্বাণ এই

স্থানে হইয়াছিল বলিয়া, ইহা 'গুরুপাদ গিরি' নামে খ্যাতি লাভ করে।

মহাকাশ্যপ তথাগতের প্রধান শিষ্য। পরি-নির্ব্বাণের প্রাক্কালে মহাকাশ্যপকে তথাগত নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—'আমি বহু কল্পকল্পান্তর বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছি মানবের হিতসাধনের জন্য। এক্ষণে আমি মহা-পরিনির্ব্বাণের লাভের জন্য প্রস্তুত। তোমার উপর আমি আমার ধর্ম্মপিটকের সংরক্ষণ-ভার অর্পণ করিতেছি। তুমি আমার জ্ঞান ও নীতি নির্ব্বিচারে রক্ষাকর, যেন ইহ হ্রাস বা লোপ না পায়। যে সুবর্ণখোচিত কষায় অঙ্গাভরণ মহাপ্রজাপতি আমায় প্রদান করিয়াছিল তাহা সযত্নে রক্ষা করিবে এবং যখন মৈত্রেয় আবির্ভূত হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন তুমি তাহাকে এই অঙ্গাবরণ প্রদান করিও।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর মহা-কাশ্যপ রাজগৃহে প্রথম ধর্ম্ম-মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন। ৪৯৯ জন নিষ্ঠাবান শ্রমণ ও ভিক্ষু এই মহাসঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত নীতিরক্ষার জন্য 'ত্রিপিটক' রচিত হয়। বিশ বৎসর যাবৎ তিনি সঙ্ঘনেতা থাকিয়া বুদ্ধের ধর্ম্ম ও বিনয় প্রচার করেন। তারপর ক্ষণভঙ্গুর সংসারের অসারতায় বিরক্ত হইয়া পরি-নির্ব্বাণ-লাভের মানসে কুক্কুটপাদ গিরির পাদদেশে উপনীত হ'ন।

কুক্কুটপাদ গিরির একশত লি উত্তর-পূর্ব্বে আসিয়া আমরা

রাজধানীর উত্তর-তোরণের সম্মুখে একটি স্তূপ দেখা যায়। এই স্থানে অজাতশত্রু ও দেবদত্ত চক্রান্ত করিয়া বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য মত্তহস্তী প্রেরণ করেন। ভগবান তথাগত অলৌকিক শক্তিতে মত্তহস্তী বশ করেন। তাঁহার পাঁচ অঙ্গুলি হইতে পঞ্চসিংহ বহির্গত হওয়ায় মত্তহস্তী সম্ভ্রমের সহিত বুদ্ধের সম্মুখে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এই স্তূপের উত্তরে অন্য এক স্তূপ আছে। এই স্থানে শারিপুত্র অশ্বজিতের নিকট বুদ্ধের পরিচয় ও বাণী শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি অনুরাগী হন। এই স্থানের ঠিক উত্তরে একটি খাতের পার্শ্বে অন্য একটি স্তূপ। এই গর্ত্তে শ্রীগুপ্ত জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া উপরে মিথ্যা ভঙ্গুর আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ এই পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় খাতের মধ্যে পড়িয়া পুড়িয়া মরিবেন।

খাতের উত্তর-পূর্ব্বে নগরের প্রবেশপথের বাঁকের মাথায় একটি স্তূপ দেখিতে পাইলাম। ভীষকাচার্য্য জীবক এই স্থানে একটি চৈত্য বুদ্ধের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। চৈত্যের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ এবং বাগানের. গাছের শুকনো গুঁড়ি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তথাগত বহুদিন এই চৈত্যে বাস করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্বে জীবকের বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ আছে।

রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ১৪।১৫ লি দূরে যাইয়া আমরা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়টি দূর হইতে

একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ার মত দেখায়। পঞ্চগিরি-পরিবেষ্টিত স্থানটি নীলাম্বরের ও ধরণীর অপূর্ব্ব মিলন স্থান রূপে অবস্থিত।

যখন তথাগত এই মর-জগতে আবির্ভূত ছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া নিজ মত ও নীতি প্রচার করিতেন, তখন তিনি অধিকাংশ সময় গৃধ্রকূট-পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। রাজা বিম্বিসার স্বজনপরিবৃত হইয়া প্রাসাদ হইতে পর্ব্বত শিখরে তথাগতের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। পাহাড়টি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, শিখরের পূর্ব্বাংশে সর্ব্ব-উচ্চস্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি বিহার দেখিতে পাই। বিহারটি উচ্চ, প্রশস্ত ও সুন্দর। পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রবেশ দ্বার, এই দ্বারমণ্ডপে দাঁড়াইয়া তথাগত ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বিহারের পার্শ্বেই ৩০ পা পরে ১৪।১৫ ফিট উচ্চ একটি প্রস্তরখণ্ড এখনও রক্ষিত আছে। কিংবদন্তী আছে দেবদত্ত প্রস্তরখণ্ডটি বুদ্ধর উপর ছুড়িয়া মারিয়াছিল। তাহারই নিকটে ধর্ম্ম-প্রচার মুদ্রায় উপবিষ্ট তথাগতের পূর্ণাবয়ব একটি প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়।

বিহারের দক্ষিণে গিরিশৃঙ্গের নিম্নাংশে একটি স্তুপ আছে। এই স্থানে বুদ্ধ ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক সূত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অনতি-দূরে দক্ষিণে একটি বৃহৎ গুহা। এখানে তথাগত মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেন।”

ফা-হিয়ানও যখন এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তখন

তিনি এই গুহা দর্শন করেন এবং বুদ্ধ এখানে অধিক সময় বাস করিতেন অবগত হইয়া শ্রদ্ধায় অজস্র অশ্রুবর্ষণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধ এই স্থানে 'সুরঙ্গম ও সধর্ম্ম পুণ্ডরীক সূত্র' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য গৃধ্রকূট পর্ব্বত পরম পবিত্র স্থান।

হিউয়েন সাং বলেন—"এইস্থানেই আনন্দের কক্ষ, তাহার পাশে এক বিশাল শিলাখণ্ড বিরাজিত, গভীর রাত্রে মার, শকুনির আকার ধরিয়া এই প্রস্তরখণ্ডের উপর পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া বিকট শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া আনন্দ ভয় পাইতেন। তথাগত আনন্দের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে প্রস্তরের দেওয়াল ভেদ করিয়া তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া অভয় প্রদান করিতেন।"

উক্ত বিহারের সংলগ্ন অনেকগুলি ছোট-বড় গুহা। তথায় সারিপুত্রপ্রমুখ অর্হৎগণ বাস ও সাধনা করিতেন। পুরাকালে এখানে যে কূপ ছিল তাহার গভীর গর্ত্ত এখনও বর্ত্তমান।

বিহারের উত্তর-পূর্ব্বে জল-ধারার মধ্যে একটি মসৃণ প্রস্তর দেখা যায়। তাহার উপরে তথাগত কষায় পরিচ্ছদ শুকাইতেন। প্রস্তরের উপর কষায় বস্ত্রের ভাঁজের দাগ খোদিত ছিল। ইহারই পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রের একস্থানে তথাগতের চরণচিহ্ন খোদিত। যদিও চরণপদ্মের চক্রটি মুছিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা তাহা এখও দেখিতে পাই।

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণের পশ্চিমে বিপুলগিরি। এই স্থানে পূর্ব্বে পাঁচশত সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। কিন্তু আমি দশটি মাত্র উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাই; কতকগুলি নাতিউষ্ণ এবং কতকগুলি ঠাণ্ডা—অতিউষ্ণ প্রস্রবণ খুব কম। প্রস্রবণগুলির উৎপত্তিস্থান হিমগিরির পদতলে অনবাতপ্ত হ্রদ। প্রস্রবণগুলির নির্গমস্থানে বক্রাকারের পাথরের নল মুখ বসান, কোনটি সিংহ বা কোনটি হস্তীর মুখাকৃতি। কোন কোনটির মুখ উর্দ্ধ দিকে করা হইয়াছে। সেইগুলি হতে জলধারা আকাশের দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া নিম্নের পুষ্করিণীর আকারের পাথর দিয়া বাঁধান, বড় বড় কুণ্ডে সঞ্চিত থাকে। দেশ-দেশান্তর হইতে নর নারী এই সব কুণ্ডে স্নান করিয়া আরাম পাইত এবং চর্ম্মরোগাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইত। প্রস্রবণগুলির ডান ও বাম দিকে বহু স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে।

প্রস্রবণগুলির পশ্চিমে পিপ্পলি গুহা। এই স্থানেও তথাগত অনেক সময় অবস্থান করিতেন।

ফা-হিয়ানও এই গুহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় গুহাটী নূতন নগরের দক্ষিণে তিন শত পা দূরে পশ্চিম অংশে অবস্থিত। তদনুসারে কানিংহ্যাম পিপ্পলি গুহা 'বৈহারগিরি'তে বলিয়াছেন। কারণ চীন শব্দ 'পি-পু-লো' অর্থে 'বৈহার'। অনেকে অনুমান করেন বর্ত্তমানে এই গুহা 'সোনাভাণ্ডার' নামে খ্যাত।

হিউয়েন সাং বলেন,—"গুহাটির সন্নিকটেই জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নসৌধ দেখা যায়। ইহা একটি অসুররাজের প্রাসাদ। ভিক্ষুরা সাধন-ভজন করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিতেন। আমরা কিন্তু সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু গুহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছি।

বিপুলগিরির শৃঙ্গোপরি একটি স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানে বসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বর্ত্তমানে দিগম্বর নিগ্রন্থ-পন্থিগণ বহু সংখ্যায় এই স্থানে সমবেত হয়; দিবারাত্র কঠোর তপস্যা করে; প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্তূপ প্রদক্ষিণ করে।

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ হইতে কিঞ্চিত পূর্ব্বে দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের উত্তর ধারে দুই কি তিন লি যাইয়া আমরা একটি বৃহৎ গুহার সম্মুখে উপস্থিত হই। এই স্থানে দেবদত্ত বাস করিতেন।

গিরিব্রজের উত্তর-তোরণ হইতে এক লি অন্তরে 'কারণ্ড বেণুবন'। এখানে একটি বিরাট বিহারের ইষ্টক-প্রাচীরের ভিতরে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই। বিহারের দ্বার পূর্ব্বাভি-মুখে ছিল। তথাগত এই স্থানে বসিয়া মানব-পরিত্রাণের নানা পথ ও মত ব্যক্ত করিতেন। এখনও সেই স্থানে তথাগতের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি স্থাপিত। এই অঞ্চলে কারণ্ড নামে এক ধনী গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি অবিশ্বাসিগণের বাসের জন্য বেণুবন দান করেন। ইহাতে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরে তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার বাণী শুনিয়া

তাঁহার প্রতি অনুরাগী হন এবং অনুতপ্তচিত্তে অবিশ্বাসিদের বেণুবন্ হইতে বিতাড়িত করিয়া জ্ঞানী ও গুণী বুদ্ধশিষ্যগণের বাসেরজন্য এক বিরাট বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথাগতের হস্তে অর্পণ করেন।

কারণ্ড বেণুবনের পূর্ব্বে একটি স্তূপ। রাজা অজাতশত্রু তথাগতের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ দাবী করেন। অপর রাজারাও প্রার্থী হন। বিবদমান রাজাদের মধ্যে বুদ্ধাস্থি আট ভাগে বিভক্ত হয়। অজাতশত্রু এক ভাগ পান। তিনি সেই পবিত্র অস্থি সমারোহে ও শ্রদ্ধার সহিত আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর সেই স্তূপটি সংস্কার করিয়া তাহার মধ্য হইতে অস্থি বাহির করিয়া উহার সংরক্ষণের জন্য এক বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

স্তূপটির পার্শ্বে তথাগতের সহচর ও শিষ্য আনন্দের দেহের অর্দ্ধাংশের উপর একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। আনন্দ তাঁহার দেহত্যাগের সময় বৈশালী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বৈশালী ও মগধের রাজাদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। আনন্দের দেহাবশেষ পাইবার জন্য তাঁহারা যুদ্ধের আয়োজন করেন, পরস্পর সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তথাগতে অহিংসা-বাণী সার্থক করিবার জন্য আনন্দের দেহ আপনা হইতে দুই অংশে বিভক্ত হয়।

মগধের রাজা এক অংশ লইয়া রাজগৃহে আগমন করেন এবং সেই পবিত্র দেহভাগ রক্ষিত করিবার জন্ত স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই স্তূপের অনতিদূরে আর একটি স্তূপ। এই স্থানে শারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন বর্ষাবাস করিতেন। বেণুবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫।৬ লি যাইলে উচ্চগিরির উত্তর পার্শ্বে প্রকাণ্ড (সপ্তপর্ণি) গুহা। এই স্থানে মহাকাশ্যপ তথাগতের পরিনির্ব্বাণের পর প্রথম মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন। পাঁচ শত অর্হৎ সমবেত হইয়া বুদ্ধবচনগুলি ত্রিপিটক গ্রন্থত্রয়ে সংগ্রহ করেন। অজাতশত্রু পর্ব্বতদেহ কাটিয়া এই দালান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গুহার সম্মুখভাগের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্পষ্ট।

বুদ্ধের তিরোভাবের পর স্থবির মহাকাশ্যপের আহ্বানে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে যোগদানের জন্য বহু ভিক্ষু উপস্থিত হন। মহাস্থবির তন্মধ্যে পাঁচ শত জনকে সভায় যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

পাঁচ শত অর্হতের অধিবেশনের পূর্ব্বে মহাস্থবির-কাশ্যপ আনন্দকে বলিলেন—আনন্দ তুমি সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত নহ, অতএব তুমি সঙ্গীতিতে যোগদান করিতে পার না। আনন্দ অনুযোগ করিলেন না, কেবল বলিলেন—'বহু বৎসর যাবৎ অমি তথাগতের সেবা করিয়াছি, আমি ছায়ার মত তাঁহার অনুগমন করিয়াছি। তিনি যখন যে স্থানে যে কোন উপদেশ

দিয়াছেন তাহা আমি সমস্তই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি। আশ্চর্য্য, যখন আপনি তাঁহার ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিতে উদ্যত তখন আমার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে মহাসভা হইতে বাদ দিতেছেন। হায়! করুণাসিন্ধু ভগবান বুদ্ধ উপস্থিত না থাকায় আমার এই অনাদর।

মহাকাশ্যপ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন—'আনন্দ, ক্ষোভ করিও না, তুমি তথাগতের ব্যক্তিগত অনুচর ছিলে, তুমি তাঁহার বহু বাণী শুনিয়াছ—ইহাও সত্য, কিন্তু তুমি তাঁহার প্রতি আসক্ত সুতরাং তোমার চিত্ত এখনও অনাসক্ত নহে। তোমার অধিকার নাই, সাধনার দ্বারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলে এই সভায় যোগ দিতে পারিবে।'

আনন্দ সঙ্ঘ নেতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সভাগৃহ হইতে বাহির হইলেন। দূরে নির্জ্জন বনমধ্যে ধ্যানরত হইলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি মহাসভাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বার খুলিবার জন্য আঘাত করিলেন এবং তাঁহার অর্হত্ব-প্রাপ্তির সংবাদ মহাকাশ্যপকে জানাইলেন। তখন সভার অধিবেশন এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছে। মহাকাশ্যপ তখন বলিলেন—'আনন্দ যদি তুমি তোমার সকল আসক্তি বিনষ্ট করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার প্রমাণস্বরূপ তুমি তোমার দিব্যশক্তিপ্রয়োগ করিয়া দ্বার উদঘাটন না করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ কর।' তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আনন্দ চাবির গর্ত্তের মধ্য দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ

করেন। অন্যান্য বিবরণে প্রাচীরের মধ্য দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিবার কথা উল্লেখ আছে। তিনি আচার্য্য-প্রধানকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করেন।

আনন্দের আগমনে মহাকাশ্যপের অপার আনন্দ। তিনি বলেন, আনন্দ তথাগতের অনুচর ছিলেন এবং তাঁহার বহু বাণী নিত্য শুনিবার সৌভাগ্য আনন্দের হইয়াছিল। তিনি আপনাদিগের নিকট ধর্ম্ম আবৃত্তি করিবেন এবং সেই সারবাণী সঙ্কলিত হইয়া 'সূত্রপিটক' প্রণীত হইবে। উপালি যিনি সমস্ত বিনয় আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি তাহা আবৃত্তি করিবেন। তাহাতে 'বিনয়পিটক' রচিত হইবে। আমি কাশ্যপ 'অভিধর্ম্ম-পিটক' আবৃত্তি করিব। এই প্রকারে বর্ষার তিনমাস অতিবাহিত হইল। 'ত্রিপিটক' রচিত হইল। 'ত্রিপিটক' বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ। মহাকাশ্যপ এই মহাসভার নায়ক বা সভাপতি ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে মহাস্থবির উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল।

সপ্তপর্ণি গুহার উত্তর-পশ্চিমে আনন্দের অর্হত্ব লাভের স্থানে এক স্তূপ দেখিতে পাই। এই স্তূপের বিশ লি পশ্চিমে অশোক-নির্ম্মিত একটি স্তূপ। এইস্থানে ধর্ম্ম মহা সঙ্গীতিতে যোগদান করিতে পারেন নাই এমন এক লক্ষ ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। ঐ শ্রমণগণ 'ক্ষুদ্রক-নিকায়-পিটক' ও 'ধারনী-পিটক' নামে

ত্রিপিটকের অতিরিক্ত অপর দুইখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বেণুবন-বিহারের উত্তরে দুইশত পা যাইয়া আমরা করণ্ড হ্রদের তীরে উপস্থিত হই। তথাগত এখানে বহুবার ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। হ্রদের জল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ছিল। তথাগতের তিরোভাবের কিছুদিনের মধ্যে হ্রদের জল শুকাইয়া যায়।

হ্রদেব উত্তর-পশ্চিমে দুই বা তিন লি অন্তরে ষাট ফিট উচ্চ অশোক-নির্ম্মিত সুন্দর স্তূপ। স্তূপের সংলগ্ন ৫০ ফিট শিলা-স্তম্ভ, স্তম্ভের শিবোভাগে হস্তিমূর্ত্তি এবং গাত্রে স্তম্ভ-নির্ম্মাণ বিষয়ক লিপি উৎকীর্ণ আছে।

শিলাস্তম্ভের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বে নগর-তোরণের ভিতর দিয়া পুনরায় আমরা রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি। নগবের বহিঃপ্রাচীর অধিকাংশ স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখনও কতক কতক অংশ দেখা যায়। প্রাসাদ ও দুর্গের দেওয়াল এখনও দণ্ডায়মান, নগবটি বৃত্তাকারে ২০ লি। বিম্বিসাব কুশাগ্রপুরে ইট-চূণ-বালি-পাথরেব প্রাসাদ ও নগর-প্রাচীর প্রথম নির্ম্মাণ করেন। তখন হইতে নগরের নাম রাজগৃহ।

কাহারও কাহারও মতে অজাতশত্রু রাজগৃহ পত্তন করিয়াছিলেন। তবে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে নগরের আয়তন ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার বংশধরগণও নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। অশোকের রাজত্বের প্রথম অংশে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। অশোক রাজগৃহ

হইতে গঙ্গাতীরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাটলিপুত্র নগর পত্তন করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অশোক রাজগৃহ নগরটি ব্রাহ্মণকে দান করেন। তাহার ফ্যল এখন রাজগৃহে সাধারণ লোকের বাস নাই। কেবল হাজার ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

রাজগৃহের রাজপ্রাসাদেব দক্ষিণ-গশ্চিম কোণে ছোট ছোট দুইটি সঙ্ঘারাম। আগন্তুকেবা এখানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমে একটি স্তূপ। এই স্থানে নগরশ্রেষ্ঠী জোতিষ্ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অট্টালিকার প্রাচীব ছিল বৌপ্যমণ্ডিত, মেঝে কাঁচের দ্বাবা আবৃত, আসবাব স্বর্ণময়, আমত্যবর্গ মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিহিত, পবিচারিকাগণ রূপে অপ্সবা।

নগরের দক্ষিণ-তোবণের বাহিরে রাস্তার বাম-পার্শ্বে একটি স্তূপ। এইখানে তথাগত স্বীয় পুত্র রাহুলকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

অনেক পণ্ডিতের মত কপিলাবাস্তুতেই রাহুলের দীক্ষা হইয়াছিল।

নালন্দা

নালন্দা বর্ত্তমানে বড়গাঁও নামে পরিচিত এবং রাজগৃহ হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েয় সৌধাবলী প্রায় দুই মাইল ব্যাপিয়া নির্ম্মিত। বহু বিহার

সঙ্ঘারাম, নানা মূর্ত্তি, দালানেব ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করিয়া বাহিব করিয়াছে। নানা শিল্প-সম্ভার, তৈজস-পত্র, শীলমোহর ও প্রাচীন মূর্ত্তি এমন কি পোড়া চাল সংগৃহীত হইয়া মিউজিয়াম গৃহে সংরক্ষিত হইযাছে, দেখিয়া আসিয়াছি।

হিউয়েন সাং ৬২৯-৬৪০ খৃঃ অব্দেব মধ্যে নালন্দায় আগমন করেন এবং বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায সাত-আট বৎসব অতিবাহিত কবিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য-প্রধান শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যক্ষেব পদে নিযুক্ত ছিলেন। হিউযেন সাং তাঁহার নিকট কয়েক বৎসব অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন। তখনও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-গরিমায় জগতে অতুলনীয়। বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ আসিত। নালন্দায় ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ছাত্রাবাসের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, শিক্ষা-মন্দিব, শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রকাণ্ড দালান, বিশাল উপাসনাগার, শ্রমণদের কক্ষ, অতিথিশালা, বিহার, সঙ্ঘাবাম, পাকশালা, কূপ, মঠাদি সৌধাবলীব বিশালতা হইতে কতক পবিমাণে নালন্দার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করা যায়।

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"নালন্দা মঠের চারিদিকে প্রায় শতাধিক স্তূপ, বিহার, মঠ। প্রধান সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটি বিহার। এই

বিহারে তথাগত তিন মাস অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার একশ পা দক্ষিণে একটি ছোট স্তূপ। এক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট পরজন্মে রাজচক্রবর্ত্তী হইবার বর চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হন। ভিক্ষু নির্ব্বাণ লাভ করিরার উপযুক্ত হইয়াও বাসনা প্রভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও বহু কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিবেন!"

স্তূপের দক্ষিণাংশে অবলোকিতেশ্বরের দণ্ডায়মান অপরূপ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে ধূপ-ধূনা পোড়ান হয়। তাহার সুগন্ধে সমস্ত স্থান ভরিয়া উঠে। মূর্ত্তির দক্ষিণে বুদ্ধ তিন মাস অন্তর কেশ ও নখ কর্ত্তন করিতেন। সেই স্থানে এখন একটি স্তূপ আছে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর বিশেষতঃ শিশুগণের রোগমুক্তির মানত করিয়া বহুলোক এখানে আগমন করে এবং কেশ ও নখ কর্ত্তন করে।

এই স্তূপের দক্ষিণে শিলাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পিতলের বৃহৎ বিহার। বিহারটি অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ হইলে তাহা দৈর্ঘ্যে একশত ফিট হইত।"

[পিতলের বিহার সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আছে। মেডহার্ষ্ট সাহেব বলেন, উক্ত বিহার 'ক্যালামাইল' প্রস্তর দ্বারা গঠিত। চীনা গ্রন্থে এই প্রস্তরকে উৎকৃষ্ট দেশীয় তাম্র বলা হইয়াছে। এই পাথরের খনি 'পোশী' (posse) দেশে পাওয়া যায়। তাহা দেখিতে ঠিক সোনার মত। অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা

রক্ত বর্ণ ধারণ করে, কখনও কাল হয় না। ইহা সিন্ধু ও সাগর-সঙ্গমের নিকট ক্যালামিনা দেশে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর সহজে গলে এবং পাতলা পিতলের চাদরে পরিণত হয়। শিলাদিত্য ক্যালমিনা (Calamina of Chinese—Po-see) অঞ্চল হইতে এইরূপ পাত আনাইয়া বিহারের গাত্র আবৃত করিয়াছিলেন। (Beals Records of Western Countries, Book IX. Page 147.)

"দুইশত পা পূর্ব্বে বুদ্ধের একটি দণ্ডায়মান তাম্রমূর্ত্তি উচ্চ বিহারের প্রাচীরের বহিরাংশে স্থাপিত আছে। মূর্ত্তিটি ৮০ ফিট উচ্চ, পূনবর্ম্ম রাজার দ্বারা নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির ২।৩ লি উত্তরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বিহারের মধ্যে এক বিরাট তারা মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি উচ্চ, এবং ইহার আধ্যাত্মিক বিভূতি অপূর্ব্ব। প্রতি বৎসর এই স্থানে বিরাট উৎসব হয়। রাজা, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিছিল করিয়া বাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্য সহ মূর্ত্তির নিকট আগমন করেন এবং গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প অর্ঘ প্রদান করেন। শত সহস্র নর-নারী নানা রঙের পতাকা ও চন্দ্রাতপ বহন করে আনে।"

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের বিষয় লিখিয়াছেন,—"নালন্দায় বহু সহস্র উচ্চস্তরের বিদ্বান ও প্রতিভাবান আচার্য্য অবস্থান করিতেন এবং এখনও করেন। বর্ত্তমানে শতাধিক আচার্য্যের খ্যাতি বহু দূর-দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও

বিহারে তথাগত তিন মাস অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার একশ পা দক্ষিণে একটি ছোট স্তূপ। এক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট পরজন্মে রাজচক্রবর্ত্তী হইবার বর চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হন। ভিক্ষু নির্ব্বাণ লাভ করিরার উপযুক্ত হইয়াও বাসনা প্রভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও বহু কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিবেন!"

স্তূপের দক্ষিণাংশে অবলোকিতেশ্বরের দণ্ডায়মান অপরূপ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে ধূপ-ধূনা পোড়ান হয়। তাহার সুগন্ধে সমস্ত স্থান ভরিয়া উঠে। মূর্ত্তির দক্ষিণে বুদ্ধ তিন মাস অন্তর কেশ ও নখ কর্ত্তন করিতেন। সেই স্থানে এখন একটি স্তূপ আছে। ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর বিশেষতঃ শিশুগণের রোগমুক্তিব মানত করিয়া বহুলোক এখানে আগমন করে এবং কেশ ও নখ কর্ত্তন করে।

এই স্তূপের দক্ষিণে শিলাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পিতলের বৃহৎ বিহার। বিহারটি অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ হইলে তাহা দৈর্ঘ্যে একশত ফিট হইত।"

[পিতলের বিহার সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আছে। মেডহার্ষ্ট সাহেব বলেন, উক্ত বিহার 'ক্যালামাইল' প্রস্তর দ্বারা গঠিত। চীনা গ্রন্থে এই প্রস্তরকে উৎকৃষ্ট দেশীয় তাম্র বলা হইয়াছে। এই পাথরের খনি 'পোশী' (posse) দেশে পাওয়া যায়। তাহা দেখিতে ঠিক সোনার মত। অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা

রক্ত বর্ণ ধারণ করে, কখনও কাল হয় না। ইহা সিন্ধু ও সাগর-সঙ্গমের নিকট ক্যালামিনা দেশে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর সহজে গলে এবং পাতলা পিতলের চাদরে পরিণত হয়। শিলাদিত্য ক্যালমিনা (Calamina of Chinese—Po-see) অঞ্চল হইতে এইরূপ পাত আনাইয়া বিহারের গাত্র আবৃত করিয়াছিলেন। (Beals Records of Western Countries, Book IX. Page 147.)

"দুইশত পা পূর্ব্বে বুদ্ধের একটি দণ্ডায়মান তাম্রমূর্ত্তি উচ্চ বিহারের প্রাচীরের বহির্ভাগে স্থাপিত আছে। মূর্ত্তিটি ৮০ ফিট উচ্চ, পূর্নবর্ম্ম রাজার দ্বারা নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির ২।৩ লি উত্তরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বিহারের মধ্যে এক বিরাট তারা মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি উচ্চ, এবং ইহার আধ্যাত্মিক বিভূতি অপূর্ব্ব। প্রতি বৎসর এই স্থানে বিরাট উৎসব হয়। রাজা, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিছিল করিয়া বাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্য সহ মূর্ত্তির নিকট আগমন করেন এবং গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প অর্ঘ প্রদান করেন। শত সহস্র নর-নারী নানা রঙের পতাকা ও চন্দ্রাতপ বহন করে আনে।"

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের বিষয় লিখিয়াছেন,—"নালন্দায় বহু সহস্র উচ্চস্তরের বিদ্বান ও প্রতিভাবান আচার্য্য অবস্থান করিতেন এবং এখনও করেন। বর্ত্তমানে শতাধিক আচার্য্যের খ্যাতি বহু দূর-দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও

নিষ্কলুষ। তাঁহারা কঠোর বিধি-ব্যবস্থা, নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত তাঁহারা শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনায় রত থাকেন। নবীন ও প্রবীণ অধ্যাপকগণ মিলিত হইয়া পরম সত্য ও গভীব তত্ত্বের আলোচনায় কালক্ষেপ করেন। যাঁহারা ত্রিপিটকেব সূত্র বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কবিতে অক্ষম হইতেন তাঁহাদেব কেহ শ্রদ্ধা করিত না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কবিতে হইলে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। দূব দেশ হইতে আসিয়াও পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইলে প্রবেশ অধিকার পাইতেন না। ফিবিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন।

অনেক বিশিষ্ট মহাপণ্ডিতেব কথা, যাঁহারা নালন্দা মহাবিদ্যালয় অলঙ্কৃত কবিযাছিলেন, শুনিয়াছি। যেমন—ধর্ম্মপাল (কাঞ্চিপুর নিবাসী 'শব্দবিদ্যা সম্মুক্ত' শাস্ত্র-প্রণেতা। ওয়াটার্স সাহেবেব মতে ধর্ম্মপাল ৬০০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ কবেন)। চন্দ্রপাল, যিনি গৃহী ও মূর্খকে গভীর জ্ঞানদ্বাবা দিব্য চেতনা দিতেন। গুণমতি, যাঁহার গভীব জ্ঞানের খ্যাতি পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। (গুণমতি, ধর্ম্মপালের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।) স্থিরমতি সর্ব্বজনপূজ্য বিচক্ষণ অধ্যাপক, যাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য চীন দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিত। (স্থিরমতি গুণমতির সমসাময়িক।) প্রভামিত্র জৈন শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যাকার বলিয়া বিখ্যাত। তিনি মধ্য-ভারতের এক ক্ষত্রিয় পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি ৬২৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর তথায় অধ্যাপনা করিয়া ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সেই দেশেই দেহ রাখেন। জিনমিত্র বাগ্মিতার জন্য জগৎ-বিখ্যাত ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র মহাপণ্ডিত, তাঁহার জীবনে বাক্য ও কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। শিগ্রবুদ্ধের গভীর জ্ঞানের খ্যাতি জগৎ-বাসী কখনও ভুলিবে না। অধ্যক্ষ শীলভদ্রের অধ্যাপনার দক্ষতা পৃথিবীতে অতুলনীয়।"

বুদ্ধের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র, বৌদ্ধাচার্য্যাগণের বিশিষ্ট সাধন-কেন্দ্র রাজগৃহ বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণও ভারতবাসীর নিকট অনাদৃত। আজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কালে, সমগ্র এসিয়াবাসী বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ বুদ্ধের লীলাস্থান ভারতের দিকে চাহিয়া আছেন শান্তির বাণী শুনিবার নিমিত্ত। এখানে বৌদ্ধ উপনিবেশ স্থাপনের আশু প্রয়োজন। সারি-পুত্র ও মৌদগল্যায়নের জন্মস্থান রাজগৃহে স্তূপ-গঠন ও তাঁহাদের পবিত্র অস্থি-সংরক্ষণ সমীচীন।

সুখের বিষয় এখন নালন্দায় এক মহাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। ভিক্ষু কাশ্যপের পরিচালনায় পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রর সুযোগ হইয়াছে।

অজন্তা

জানিনা বুদ্ধদেবের কি মহিমা বলে অজন্তার গুহাগুলি শিল্পজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র বিশ্ববাসী আজও অজন্তার স্থাপত্য, চারুকলা, ভাস্কর্য্য ও লেপ্যচিত্রাবলী দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হয়। বুদ্ধ কখনও অজন্তায় পদার্পণ করেন নাই। বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য কেহ অজন্তায় বাস করেন নাই। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকেরও প্রতিষ্ঠিত কোন স্তম্ভ বা চৈত্য অজন্তায় নাই।

স্বাধীন ভারতে প্রাচীন কাল হইতে ঋষিগণ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর উপাসক। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সাধকগণ প্রকৃতির মনোরম লীলাক্ষেত্রে, নদনদী-সঙ্গমে, পার্ব্বত্য গুহায়, সাগর উপকূলে, দুর্গম কান্তারে, তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গে, জনবিরল কাননমধ্যে আশ্রম, মন্দির, স্তূপ, চৈত্য বিহারাদি স্থাপন করিতেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ বুদ্ধের মহিমা চির-জাগ্রত রাখিবার জন্য শিল্পসৃষ্টি করিতেন। তাঁহাদের সাধনায় এক অপূর্ব্ব শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল এই অজন্তায়। বাঙ্গালার পটুয়াগণেরও কৃতিত্ব অজান্তার মনোরম লেপ্যচিত্রে প্রকাশিত হইয়া আছে। সেইজন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :—

"আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদেরই পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।"

সহ্যাদ্রির সংলগ্ন এই অজন্তার পাহাড়টি প্রকৃতির মনোরম ক্রোড়ে অবস্থিত। কবিজনোচিত ভাব-বিলাসের সকল উপকরণ সেখানে অনায়াসলব্ধ। হরশৃঙ্গার পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ, বনময়ূরের কেকারব ও ঝরণার অপূর্ব্ব মধুর কলধ্বনিতে মানব চিত্ত পুলকে ভরিয়া উঠে। পার্ব্বত্য নদী 'বাঘোরা' চিরসবুজ লতাগুল্মে আবৃত অজন্তা পাহাড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে মৃদুমন্দ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর জল গভীর না হইলেও কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও খর-স্রোতা। অজন্তাগুহার প্রবেশপথের সেতুর উপর হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাহাড়ের গায়ে কপোতনীড়ের ন্যায় কারু-কার্য্য মণ্ডিত গুহার দ্বার ও মণ্ডপগুলি মনোরম দেখায়। কাননের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে বাঘোরা নদীর গর্ভ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তিনশত ফিট উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে সহস্রাধিক ফিট বিস্তৃত পর্ব্বত-গাত্রে গুহাগুলি দূর হইতে মনোরম দেখা যায়। অজন্তা নিজাম রাজ্যের উত্তরসীমায় অবস্থিত। নিজাম সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যত্নে পুরাতন গুহাগুলি সুরক্ষিত ছিল; ১৯৫০ খৃঃ হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে।

ইতিহাস

বুদ্ধের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নর্ম্মদার দক্ষিণে প্রসার লাভ করে নাই। বৌদ্ধসম্রাট অশোকের রাজত্বের প্রথম ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম মোটের উপর মধ্যদেশেই নিবদ্ধ ছিল। বুদ্ধের

জীবদ্দশায় মধ্যদেশের বাহিরে এবং পশ্চিমদিকে মথুরা এবং উজ্জয়িনী অঞ্চলে অবন্তীবাসী স্থবির মহাকাত্যায়নের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সামান্য প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। তবে পালি নিকায় গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মহিমা দক্ষিণে গোদাবরীর তীরস্থ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এবং পশ্চিম-ভারতে সূনাপরান্ত দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগে বৌদ্ধপ্রচারকগণ মহারাষ্ট্র, সূনাপরান্ত, মহিষমণ্ডল ও বনবাসী দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্র অঞ্চল আধুনিক নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। এ সকল প্রচারকগণের প্রচারকার্য্যের সাফল্যেই যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবকালে ও পরবর্ত্তী শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এবং গোদাবরীর সন্নিহিত স্থানসমূহে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বৌদ্ধগুহাগুলি খনিত ও নির্ম্মিত হয়। অজন্তা নিজামরাজ্যের আউরাঙ্গাবাদ বিভাগে এবং খান্দেশের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত; অজন্তার গুহাগুলির নির্ম্মাণকার্য্য ঐ সময় হইতে আরম্ভ হয়।

অজন্তায় মোট ৩২টি গুহা আছে। প্রত্যেক গুহার দ্বারে নম্বর দেওয়া আছে, ১ হইতে ৩২ নম্বর। তাহার মধ্যে ২৮টি বিহার, আর বাকী চারিটি চৈত্য। গুহাগুলি খনিত হইবার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুমান গুহাগুলির

নির্ম্মাণ-কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে সপ্তম শতক পর্য্যন্ত। প্রত্যেকটি গুহার নির্ম্মাণ-কাল ধার্য্য করা কঠিন। এ বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে বহু মতভেদ দেখা যায়। ২১ হইতে ২৯ নং এবং ১৪ হইতে ২০ নং গুহাগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহাই ফার্গুসন সাহেবের মত। ৯ নং ও ১০ নং গুহাব নির্ম্মাণ-কাল ৫৫০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

সাহিত্যে ভারতের ধাবাবাহিক প্রামাণিক কোন ইতিহাস নাই। শিল্পকলাই ভারতেব ইতিহাস বচনাব প্রধান উপকবণ।

১৭ নং গুহাতে যে শিলালিপি আছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাকাটকের রাজা হবিসেনে রাজত্বকালে তাঁহার এক সামন্ত নরপতির অমাত্য এই গুহাটি 'নর্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাকাটক নবপতিগণ আট পুরুষ ধরিয়া মধ্য-ভারতে রাজত্ব কবিয়াছিলেন। তাঁহাবা গুপ্ত রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। বাকাটক বংশেব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্য-শক্তি, তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন অশ্বমেদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর তাঁহাব প্রপৌত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন দ্বিগবিজয়ে বাহিব হইয়া প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সহিত সংঘষে লিপ্ত হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ কবিয়াছিলেন। এই রূপে দুই রাজ পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপিত হয় এবং সেই সময়ে গুপ্তযুগের উন্নতি সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অজন্তার গুহানির্ম্মাণ ঐ গুপ্তযুগের শিল্প সাধনার প্রভাব পায় ও রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে। অজন্তার গুহা যে কেবল রাজ-অনুগ্রহে নির্ম্মিত তাহা নয়। বৌদ্ধভক্ত ভিক্ষুদের অর্থেও কয়েকটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। অজন্তায় একটি খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শ্রমণ বুদ্ধভদ্র ২৬ নং গুহা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য ভদ্রবন্ধু প্রতিভু ও ধর্ম্মদত্ত এই গুহা-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। লিপিটি তৃতীয় কি চতুর্থ শতকের বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন।

২০ নং গুহার স্তম্ভের গায়ে একটি লিপির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাহা পাঠে জানা যায় যে, কৃষ্ণদাসের পুত্র উপেন্দ্র নিজ ব্যয়ে মণ্ডপটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

২৬ নং গুহাতে একটি মূর্ত্তির পাদপীঠে লিখিত আছে যে, শাক্য ভিক্ষু তদন্তগুণকনীয়ের দানে এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় যে সকল স্থপতি, শিল্পি, চিত্রকর গুহাগুলি মনোরম চিত্তাকর্ষক করিয়া ছিলেন তাহাদের নাম বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

নানা মত হইতে ঠিক করা যায় যে ৮, ৯, ১২ ও ১৩ নং গুহা চারিটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ৯ নং গুহার ডান দিকে একটি স্তম্ভে এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ৮ ও ৯ নং দুইটি গুহাই খৃঃ দ্বিতীয় শতকে

ও ১০ নং গুহাটি পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১ ও ২নং গুহা সমসাময়িক। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুহা দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১০ নং গুহার গৌরাকৃতি খিলানে একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি আছে। ইয়াজদানি সাহেব অনুমান করেন এই গুহার শিল্প ঐশ্বর্য্য ও চিত্র গুলি দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত ও অঙ্কিত হইয়াছিল।

১৫ নং গুহাটি গুপ্তযুগের প্রথম ভাগে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ১৬ নং গুহাটি স্থবির অচল দ্বারা নির্ম্মিত। হিউয়েন সাং "ও-চে-লো" নামে এক অর্হতের উল্লেখ করিয়াছেন। যদি "ও-চে-লো" এবং অচল একই ব্যক্তি হন, তবে এই গুহাটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭ নং গুহার বাহিরের বারান্দার ডানদিকে বাকাটক রাজবংশের একটি খোদিত লিপি আছে। ইহার দ্বারা অনুমান হয় এই গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; লিপির এক অংশে আছে "পুরন্দরোপেন্দ্রসমত প্রভাবঃ স্ববাহু-বীর্য্যার্জ্জিতলোপঃ রাজা মহেন্দ্রেব ভূবি বিন্ধ্যকানাম্ বভূব বাকাটকবংশকেতুঃ"।

১৯ নং গুহার মূর্ত্তিগুলি গুপ্তযুগের শিল্পকলারই মতন। তাহা হইতে এই গুহাটি ৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাত নির্ম্মিত হইয়াছে অনেকে মনে করেন। ২৬ নং গুহার লিপি ইহার সমসাময়িক।

২৩ নং গুহার নির্ম্মাণকাল ৪০০ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ফার্গুসনের মতে ২১ হইতে ২৯ নং গুহা এবং ২০ নং গুহা ৫ম শতাব্দীর মধ্যে খোদিত।

গুরুদাস সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ গুহাগুলিকে গঠনকালানুযায়ী তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—প্রাচীনতম ৯ নং ও ১০ নং, মধ্যবর্ত্তী কালের ১৬, ১৭ ও ১৯ নং এবং সর্ব্বশেষের ১, ২, ২১ ও ২২ নং। ৯ নং গুহাচিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ সাঁচী ও ভারহুত শিল্পের পোষাক পরিচ্ছদের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়, তাই অঙ্কনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ৯ নং ও ১০ নং গুহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীরও বলিয়া ধরিতে পারা যায়। * * * ১৯ নং গুহার আনুমানিক নির্ম্মাণ কাল ৫৫০ খৃঃ অব্দ। ২৬ নং গুহা তত্রস্থ শিলালিপির সমসাময়িক। এলোরা গুহার প্রাচীনতম শিল্পের সহিত অজন্তা শিল্পের কিছু সম্পর্ক আছে।

শিল্প-ঐশ্বর্য্য

বিশ্বের শিল্পের দরবারে অজন্তার শিল্পিগণের আসন পুরোভাগে অবস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তক অজন্তার চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন এবং সৌন্দর্য্য পরিবেশন করিয়াছে। তথাপি যাহা সুন্দর, যাহা সত্য, যাহা শিব পুনঃ পুনঃ সে কথা শুনিলে বা বলিলে

পুণ্য ও আনন্দ লাভ হয়। এক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন—

"যদি অজন্তা গুহায় খোদিত পাথরের দেবতা-মূর্ত্তিগুলি মুখর হইত তাহা হইলে প্রাচীন যুগের কত মহত্ত্বের কথা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত শুনাইত।"

অজন্তার চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে অপব এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"বিশ্বের শিল্পের ইতিহাসে অজন্তার চিত্রাবলী অদ্বিতীয়। এই চিত্রগুলি কেবল যে জগৎবাসীকে তাহাদের মনোহারিত্বে এবং শিল্পদক্ষতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ করে তাহা নয়, চিত্রগুলি অঙ্কন-শিল্পের তিনটি বিশিষ্ট মর্য্যাদায় উন্নীত। কেবল অঙ্কন-সৌন্দর্য্যেই চিত্রগুলি বিশ্বেব যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রশালার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বর্দ্ধন কবিতে পারিত। ইহাদের মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য, যে-কোন বিশিষ্ট মহান সংগ্রহালয়ের মূল্য ও শোভা বর্দ্ধন করিতে পারিত। চিত্রাঙ্কনের রেখার কায়দা, পার্থিব দ্রব্যের ক্ষুদ্রাবয়বের মধ্যে স্বরূপ ফুটাইবার শক্তিমত্তা, অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সমতা-জ্ঞান, এবং পারিপার্শ্বিক মর্য্যাদা-রক্ষার কৌশল যে কোন শিক্ষা-প্রদর্শনী বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হইতে পারিত। এই ত্রিগুণ-সম্পন্ন ভারতেব চিত্রাবলী জগতের শিল্পানুরাগীর চিত্তে এক অপূর্ব্ব যোগসূত্রে রচিত পরিপুষ্ট ভাব-লহরী সৃষ্টি করে যাহা অন্য কোন কলা-কৌশল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। অজন্তা গুহার শিল্প-ঐশ্বর্য্য এমন এক সুরুচিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া

রাখিয়াছে যাহা অনভিজ্ঞ ও অমনোযোগী দর্শকেরও মনে চিত্রের একটি পূর্ণ রূপ ও সজীবতার রেখা পাত করিয়া পুলক সঞ্চার করিবে।

ইহা অতীব সত্য যে, অজন্তা গুহার চিত্রকলার খ্যাতি ও প্রভাব, উহার সুকুমার কারুশিল্পের অভিব্যক্তি ও সৃজনী শক্তি উহার চিত্রিত বিষয়াবলীর লীলায়িত ভঙ্গি ও সাবলীল গতি এবং উহার শিল্পিগণের তুলির রেখা সম্পাতের দক্ষতা মানব জীবনের গতির সহিত অনৈসর্গিক সুখ-শান্তির অপূর্ব্ব সংযোগ বিধান করে। অধিকন্তু উহা আজও জগতের শিল্পিগণকে কল্পনা ও সৃজনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার জন্যই অজন্তার শিল্প এত অধিক মহীয়ান ও গরীয়ান।”

অজন্তার শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুইটি—

প্রথম—পর্ব্বতের কুক্ষি কাটিয়া সৌধ-নির্ম্মাণ। কলিকাতার সিনেট হাউসের মত বড় বড় দালান পাহাড়ের বপু কর্ত্তন করিয়া অভ্যন্তরে গঠিত হইয়াছে। বাহির হইতে কোন উপাদান বা উপকরণ আনিতে হয় নাই। ইহার ছাদ পাহাড়, চারিটি দেওয়াল পর্ব্বতগাত্র। মেরামতের প্রয়োজন হয় না, ছাদ দিয়া জল পড়ে না অতএব সংস্কারের প্রয়োজন নাই। ভূমিকম্পেও পড়িয়া যায় না। রৌদ্রের ঝাঁজ লাগে না ও শীতের কষ্ট দেয় না। আলো ও বাতাস ঘরে বড় অল্প প্রবেশ করে। কেবল সম্মুখে প্রবেশদ্বার ও বাতায়ন। বাতায়নগুলি দ্বারের উপর অর্দ্ধগোলাকারে

এমন অবস্থায় কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে যে দালানের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোক-রশ্মি সঞ্চারিত হয়। বড় দালানের অভ্যন্তরে, পাথর কাটিয়া কাটিয়া বড় বড় থাম ছাদের অবলম্বনস্বরূপ নির্ম্মিত। কয়েকটি গুহার ছাদ সমতল আর কয়েকটির ছাদ অর্দ্ধ-গোলাকার। স্তম্ভে, ছাদের অবলম্বনীতে, সর্দ্দালে, বিমে এবং প্রবেশপথের সম্মুখভাগে কারুকার্য্য বিন্যস্ত ও মূর্ত্তি খোদিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয়—গুহার প্রাচীরগাত্র ও ছাদতল নানা বর্ণে রঞ্জিত চিত্র (লেপ্য চিত্র) দ্বারা শোভিত। চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অতি উৎকৃষ্ট। মুখের ভাব, চোখের প্রকাশ ভঙ্গি, অঙ্গের লীলায়িত গতি, দেহের সামঞ্জস্য, অলঙ্কারের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও বেশ-বিন্যাস অজন্তার শিল্পি-গণের নিপুণতা ও অতুলনীয় সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। জগতে ইহা অনুপম ও অদ্বিতীয়। স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য ও রস উপভোগ করা যায় না।

বর্ণনা

এখন অজন্তার ৩২টি গুহার এক এক করিয়া বর্ণনা প্রদত্ত হইল। প্রত্যেকটি গুহা পর্ব্বতের অংশ কাটিয়া ভিতর দিকে কুক্ষিগত করিয়া গঠন করা হইয়াছে। ছোট বড় বত্রিশটি গুহার মধ্যে ২৮টি বিহার ও ৪টি চৈত্য।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে নিজাম সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অতি যত্নের সহিত গুহাগুলি ও বিশ্বের এই মহামূল্য শিল্প-ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন গুহা সংস্কৃত এবং মেরামত করা হইয়াছে, কতগুলি গুহার চিত্রের নষ্ট অংশ পূরণ করিয়া চিত্রের বিষয়বস্তুটি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস চলিতেছে। এখনও বহুস্থান পরিষ্কার করা হয় নাই এবং তাহা যথাযথভাবে সংস্কার করিবার উপযুক্ত শিল্পী বা উপকরণ বর্ত্তমানে পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। তথাপি সংস্কার কার্য্য সমান উদ্যমে চলিয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্কারকার্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসি।

গুহার চিত্রগুলি বেশীর ভাগ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিজলী বাতির আলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে ভাল করিয়া দেখা যায় না। সরকার বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫৲ দিলে হাত আলো লইয়া একজন লোক দর্শনীয় স্থানসমূহ দেড়ঘণ্টা ধরিয়া দেখায়। তিন টাকা মূল্যের গাইড বই, আড়াই টাকার একসেট রংঙিন পোষ্টকার্ড গুহাগুলির পরিচয় পাইবার অনেক সুবিধা প্রদান করে। অজন্তার বিখ্যাত প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য্যের যথাযথ রঙ্গীন প্রতিচ্ছবির চিত্র-পেটিকা (এ্যালবাম্ নিজাম সরকার দুইখণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহার মূল্য অত্যাধিক, জ্ঞানী ও সঙ্কিৎসু গুণিগণের খরিদ করা সামর্থ্যে কুলায় না।

সকল গুহার প্রাচীরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত নাই, আবার অনেক গুহার মধ্যে কোন মূর্ত্তি খোদিত নাই।

গুহার চিত্রগুলি বুদ্ধের জীবন লীলা, বৌদ্ধ জাতকগুলির অলৌকিক কাহিনী, অশোকাদি বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি, বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও শ্রমণগণের জীবনযাত্রার ছবি, তৎকালীন সমাজ ও নরনারীর বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের চিত্র প্রকাশ করিতেছে। তখনকার শিল্পীরা চিত্র অঙ্কনে ও ভাস্কর্য্য সৃষ্টিতে, অলঙ্কারের আদর্শে এক একটা বিশিষ্ট ধারা মানিয়া চলিত। চিত্রগুলির স্বরূপ জানিতে হইলে বহু সময়ক্ষেপ করিতে হয়। অনেকেরই পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না।

১নং গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের, একটি বড় দালান, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত ফিট। ভাস্কর্য্যে, চিত্রে ও আয়তনে ১নং গুহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার সামনের দ্বারের সূক্ষ্ম কারুকার্য-মণ্ডিত স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ, পাদপীঠ, উড়াপটী ও কারনিস্ অতি সুন্দর। অভ্যন্তরের কারুকার্যবিশিষ্ট অংশ তমসাবৃত, বিনা বাতির সাহায্যে ইহার প্রাচীরচিত্রগুলি আদৌ দেখা যায় না।

জাতক সাহিত্য বুদ্ধের অতীত জীবনের নানা কাহিনীতে পূর্ণ, তাহাতে বুদ্ধের সর্ব্বশেষ জীবনের আখ্যায়িকাও লিপিবদ্ধ আছে।

এই গুহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে নিম্নের কয়েকটি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—শঙ্খপাল জাতকের চিত্র, বোধিসত্ত্ব

শিবিরাজের পারাবতের জীবনরক্ষার কাহিনী, নিজ দেহের মাংস দানে বাজপক্ষীর কবল হইতে পারবতকে রক্ষা/করার গল্প এই জাতকে বর্ণিত আছে। চম্পেয় জাতকে বর্ণিত নাগ-গণেরচিত্র,—নাগরাজ ও নাগকন্যাদিগের জলক্রীড়ার ছবি। নাগরাজরূপী বোধিসত্ত্বকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নদীতীরে মগধরাজের মিছিলের চিত্র।

মার কর্ত্তৃক বুদ্ধকে প্রলোভন প্রদর্শনের চিত্র। এক দৃশ্যে মনোহারিণী মারকন্যাত্রয়ের লুঙ্গিপরা মোনভোলান লাস্যপূর্ণ ভঙ্গী, অপর দৃশ্যে কৃষ্ণকায় ভীষণ দানবাকৃতি মারের আক্রমণ দৃশ্য। মার-সৈন্যের পলায়ন চিত্র—কাহারও কাহারও মুখবিবরে করাল দ্রংষ্ট্রা প্রকটিত; সম্মুখে স্থির, গম্ভীর, নিশ্চল বুদ্ধ উপবিষ্ট। তারপর বুদ্ধের ভয়ে মার ও দানব-দানবীদের পলায়ন।

অদূরে আর একটি বিখ্যাত চিত্রে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ অচল অটল ভাবে আসীন।

বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র মানবকে নির্জীব করে নাই। বুদ্ধের প্রভাব মানবের ক্ষণস্থায়ী দেহের উপর বিস্তৃত নহে, মানবের মনের উপরই তাহার আধিপত্য। বর্ত্তমান জগতের নর-নারী রাষ্ট্রীর ক্ষমতা পাইবার উন্মাদনায় মত্ত। যাহা মানবের এক জীবন কালও স্থায়ী নয়। বুদ্ধের অধ্যাত্ম প্রভাব আড়াই হাজার বৎসর কোটি কোটি মানবহৃদয় জয় করিয়া মহাকল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। তাই আবার বলি—

"পরশ রতন তোমারি চরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥"

রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ ব্যতীত অপরাপর মুদ্রার মূর্ত্তি—পদ্মপাণি, অবলোকিতেশ্বর ও বোধিসত্ত্বের মনোহর চিত্র আছে। তৎকালীন রাজসভা ও সামাজিক জীবনের চিত্রগুলিও মনোরম।

একটি শ্যামবর্ণ রাজকুমারী দণ্ডায়মান, রাজপুরীর দ্বারদেশে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্রহস্তে ভিক্ষা চাহিতেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কমনীয় আঁখি যেন রাজকুমারীর প্রাণে মমতার ঢেউ তুলিয়া দিতেছে। রাজকুমারীর গায়ের রঙ কাল, সে কালরূপ যেন জগৎ আলো করিয়াছে। কাল দেহে অপরূপ সৌন্দর্য্য যে শিল্পী ফুটাইতে পারে সে একজন বড় কৌশলী। কাল মেয়ের গলায় মুক্তার মালা দোলাইয়া ও মাথায় মুক্তার চুড়া বাঁধিয়া শিল্পী সাদায়-কালোয় যে অপূর্ব্ব রংএর ছটা খেলাইয়াছেন সে যেন জলদ মেঘের গায়ে সৌদামিনীর ছটাকেও ম্লান করিয়া দিতেছে। ঐ এক স্থানেই রাজা, রাণী ও রাজসভার চিত্র সেই সময়ের রাজারাজড়াদের ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের আভাস দিতেছে। আর একস্থানে প্রমোদ সভায় রাজা ও রাণী সখীগণসহ আনন্দে মগ্ন, সম্মুখে নর্ত্তকী

লীয়ায়িত সাবলীল গতিতে নৃত্য করিতেছে, এক বাদক বাঁশী বাজাইতেছে। থামের আড়ালে এক সরলা গ্রাম্যবালা সচকিত নয়নে নৃত্য দেখিতেছে, পশ্চাতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপবতী যুবতী সাগ্রহে নৃত্য দর্শনে মগ্ন। নর্ত্তকীর চক্ষুর পলক-পাতের, দেহের সুগঠনের, ও বেশভূষার সৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব ছবি শিল্পি আঁকিয়াছে! চোখ সেখান হইতে ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এরূপ অনেক ছবি আছে। গুরুদাস সরকার মহাশয় দুইটি ছবির কাহিনী অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—চিত্রটি মহাজনক জাতকের চিত্র।

"নৃত্য-লীলাস্তব্ধ রাজা তরুণ সাধুর (খুব সম্ভব বুদ্ধদেবেরই) উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেছেন। রাজা রাজ্ঞীর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত—তিনি যে রাজ্যভার ত্যাগ করিবেন, বোধ হয় তাহা রাণীকে জানাইতেছেন—সকলেই বিষণ্ণ—একটি পরিচারিকার হস্তস্থিত পদ্মকোরকটিও যেন বিষাদে এলাইয়া পড়িয়াছে। আর একস্থানে রাজার শোভাযাত্রা, রাজা যাইতেছেন অশ্বপৃষ্ঠে, বুঝি বা রাজ্য তাগ করিয়াই যাইতেছেন। তাহার পর সংসার ত্যাগ ও দীক্ষার চিত্র; রাজার মস্তকে অভিষেক বারি সিঞ্চনে তাঁহাকে দীক্ষিত করা হইতেছে। আর একটি চিত্রের নাম সুখিদম্পতী। উভয়ে বসিয়া আছেন—প্রত্যেক ভঙ্গীতেই কত না প্রণয়, কত না আদর,—ললিত সুখে উভয়েরই চিত্ত অধির। কাফ্রীর মত একটি লোক তরোয়াল হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে এক দৌবারিকের

হাতে থালায় ৪টি মুণ্ড। কে যেন বলিল, এটি 'অমরা দেবী'র উপাখ্যানের অন্তর্গত।

অজন্তার শিল্পীগণ জীবজন্তুর, গাছগাছড়ার ও নৌকার চিত্র আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। নৌকাগুলি নানা বিশিষ্ট ধরণে অঙ্কিত। সকল নৌকার মাথার অংশে দুই দিকে দুইটী চক্ষু আঁকা থাকে—এই প্রথা প্রাচীন মিশর-সভ্যতার যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। চক্ষুর টান অতীব রমণীয় ও কমনীয়। কলাগাছের, বিশেষতঃ সবুজ কাঁদিযুক্ত কলাগাছের চিত্র অনেক্ দেখা যায়। নারিকেল গাছ-গুলির কুঞ্জ চিত্রের পটভূমিকার অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

এক চিত্রে বিদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত দুইটী পুরুষ বসিয়া আছেন। সম্মুখে রাণী রাজার কাঁধে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে এক পরিচারিকা একটি জল-পাত্র হস্তে দণ্ডায়মান। রাজার শ্মশ্রুগুলফ্মণ্ডিত সহাস্য মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। সিংহাসনের নীচে দুইটী দাড়িগোঁপ যুক্ত পারস্য দেশীয় পোষাকের অনুরূপ সজ্জায় সজ্জিত অপরূপ মানব-মূর্ত্তি, পায়ে নীল ডোরা-কাটা মোজা। সম্মুখে এক থালায় রাখা উপহার সামগ্রীর প্রতি একজন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। নিজাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অজন্তার বিবরণ পুস্তকে এই দুই ব্যক্তি 'খসরু ও সিরিন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত

শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের মতে এই দুই ব্যক্তিকে পারসীক না বলিয়া শক জাতীয় বলাই যুক্তি-যুক্ত। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খসরু ও সিরিনের চিত্র প্রকট হয় নাই।

ভারতের প্রকৃত আদিবাসী ভীলদম্পতির চিত্রে শিল্পীর অতি সুনিপুণ হস্তের তুলির টান। একটি দেউলের ও একটি উল্টান জাহাজের চিত্র উড়িষ্যা স্থাপত্যের পরিকল্পনার পরিচয় দেয়। লতাপাতার দ্বারা সজ্জিত মহিষের মুখ-আঁকা চিত্রটি অতি মনোহব, যবদ্বীপের সিংহদ্বারের ডাল-পালা দিয়া খোদিত সিংহের মুখের সৌন্দর্য্যেব কথা মনে করাইয়া দেয়।

এই গুহায় আর একটি মনোরম চিত্র—কিন্নর ও অপ্সরার নৃত্য। কিন্নরদিগের মুখচোখ অতি সুন্দর, নিম্নার্দ্ধ পক্ষীর ন্যায়—তাহারা বাদক রূপে অঙ্কিত। অপ্সরাগুলি ডানাযুক্ত, মনে হয় তাহারা ব্যোমপথে বিচরণ করিতেছে। আর নৃত্য-রসে উন্মত্ত সুন্দরীদের নৃত্যভঙ্গী যেমন মনোরম তেমনই আত্মনিবেদনে রত। কবিরই ভাষায় বলি—

"আমার তনু তনুতে বাঁধনহাবা
হৃদয় ঢালে অধরা ধাবা,
তোমার চরণে হোক্ তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ,
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হ'য়ে বাজে॥"

২নং গুহা—এই গুহাটি ১ নম্বর গুহার সমকালীন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেভাগে খোদিত। চিত্র-এশ্বর্য্যেও প্রথম গুহাটির ন্যায় গরীয়ান। তবে এই গুহাতে অনেক দেব-দেবীর অলৌকিক মূর্ত্তির পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। চারিহস্ত বিশিষ্ট কয়েকটি দেবীমূর্ত্তি আছে।

গুহাটিও খুব বড়। একটি বিহার। পর্ব্বত-অভ্যন্তরে খোদিত হইয়া ভিতরদিকে গিয়াছে। ছাদ পর্ব্বত, গাত্র পাহাড়ের প্রাচীর। দেওয়ালে ও ছাদে নানা রঙ্গিন চিত্র অঙ্কিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বর্ষাসমাগমে এই বিহারে বিদেশের অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাস করিতেন।

ছাদতলে শতাধিক মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু-মূর্ত্তি অঙ্কিত তাঁহাদের হরিদ্রাবর্ণের গাত্রাবাস ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণের দেহ-কান্তি দালানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে এবং উপর হইতে যেন বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ বর্ষণে জগৎ তৃপ্ত হইতেছে। ছাদ তলে ৮।১০ ফিট লম্বা মকর ও সিন্ধুঘোটকের চিত্র সজীবতার নিদর্শন। ঝুলন, নাগরাজ, অক্ষক্রীড়া, পারাবতকে আহার্য্য দানের চিত্রগুলি অতি মনোহর।

বুদ্ধের জীবনলীলার চিত্রে যেমন ঐতিহাসিক তথ্য জানায়

তেমনই অলৌকিক ঘটনাবলীর চিত্র শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে। মায়া দেবীর স্বপ্ন ও তুষিত-স্বর্গে বুদ্ধের বোধিসত্ত্বরূপে অবস্থান চিত্রও আঁকা আছে।

মায়াদেবী স্বপ্নে দেখিতেছেন, একটি ষড়দন্ত শ্বেতহস্তী দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। মায়াদেবীর শায়িত মূর্ত্তির পার্শ্বে শ্বেতহস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। তাহার পার্শ্বে লুম্বিনীর শালবনে প্রসব বেদনাতুরা মায়াদেবী শাল্মলীতরুর শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে ভগ্নী মহাপ্রজাবতী। সন্তান সম্ভাবনা হওয়াতে মায়াদেবী শালবৃক্ষের শাখা ধরিয়া একটি পা তুলিয়া বৃক্ষে পৃষ্ঠ ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান। পরিচারিকাগণ আচ্ছাদন ধরিয়া আছেন—গর্ভ মোচন হইতেছে, বোধিসত্ত্ব মাতার ডান পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইলেন। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র স্তব করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নবজাত শিশু সাতবার পদক্ষেপ করিতেছে, শিশু পা বাড়াইতেই দেবরাজ তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন।

জাতকের কাহিনীতে উল্লেখ আছে, বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বদিকে পা বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন আমি মহানির্বাণ লাভ করিব; পশ্চিম দিকে পা ফেলিয়া বলিলেন ইহাই আমার শেষ জন্ম; দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বলেন আমার বাণী জগৎবাসীকে ত্রাণ করিবে এবং উত্তরে পা ফেলিয়া বলেন আমি সংসারের সকল শোক ও দুঃখ অতিক্রম করিব।

সমুদ্র-যাত্রাকালে পুরন্ন ও ভবিল নামে দুই বণিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বুদ্ধের নিকট কাতর প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় বুদ্ধদেব উভয়ের জীবন রক্ষা করেন। পুরন্ন কৃতজ্ঞতাবশে চন্দন-কাষ্ঠের একটি মন্দির গঠন করিয়া ত্রাণকর্ত্তার নামে উৎসর্গ করেন। তাহাই 'পুরন্ন অবদান' নামে খ্যাত। তখন স্বাধীন ভারতবাসী ভারতের অর্থে ও শ্রমে অর্ণবপোত ভারতেই নির্ম্মাণ করিত। অর্ণবপোত ভারতের পণ্য বহিয়া ভারতীয় নাবিকদ্বারা পরিচালিত হইয়া মহাসাগর-বক্ষে বিচরণ করিত। ভারতীয়েরা বিদেশের ধনে ভারত পূর্ণ করিত, আবার নানা দেশ-বিদেশে, দ্বীপদ্বীপান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিত। সেই জন্যই সমুদ্র হইতে অনেক দূরে মধ্য-ভারতে অবস্থিত অজন্তা-গুহার শিল্পিগণ অর্ণবযান-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিল। সে গৌরব এখন আর নাই। আছে কেবল স্মৃতি।

হংস জাতকের চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। পুরাকালে একদা বোধিসত্ত্ব রাজহংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ সুবর্ণময়। নব্বই হাজার রাজহংস তাঁহার অনুচর। তাঁহার নাম ছিল সুমুখ। বারাণসীর রাণী ক্ষেমা, একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটি সোনার রাজহংস তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে। রাজা রাণীর স্বপ্ন কথা শুনিয়া ঘোষণা করিলেন, কেহ রাজহংস বধ করিবে না—পক্ষিগণ অবাধে সকল জলাশয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। এই সোনার হংসদল কাশীর রাজার রাজ্যে আসিয়া সুখে বিচরণ করিতে

লাগিল। তখন রাজ আদেশই এক ব্যাধ সোনার রাজহংস-রূপী সুমুখ বোধিসত্ত্বকে পাশবদ্ধ করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মধু ও ভাজা ছোলা পান ও আহার করাইতে লাগিলেন। রাজ-দম্পতি তাহার নিকট নানা সৎ উপদেশ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। এই কাহিনী কয়েকটি চিত্রে শিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আর একটি জাতকের (ক্ষান্তিবাদী) কাহিনী অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে। পুর্ব এক জন্মে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেন। কিন্তু পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় সকল সম্পত্তি বিতরণ করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ও বারাণসীর নিকট সাধন-ভজনে রত হন। এক রাত্রিতে বারাণসীর অধিপতি প্রমোদ কাননে মধুপান করিয়া নৃত্য উৎসব করিতেছেন। মত্ত অবস্থায় রাজা নিদ্রাদেবীর কবলে পড়িলেন। গান-বাজনা বন্ধ হইল। নর্ত্তকীগণ উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। নিদ্রা-ভঙ্গের পর রাজা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তরবারিহস্তে আনন্দদায়িনীদের খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন এক নবীন সন্ন্যাসীর কাছে যুবতী নর্ত্তকীরদল সানন্দচিত্তে তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। দেখিয়াই রাজা কুপিত হইলেন।

কি উপদেশ দিতেছেন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তিতিক্ষা"। রাজা আদেশ করিলেন, উপদেশ দিতে পারিবে না। সাধু আপন মনে উপদেশ দিয়া চলিলেন। রাজার আদেশে কণ্টকাঘাতে সাধুর শরীর জর্জ্জরিত করা হইল; তাঁহার হাত, পা, নাক ক্রমে কাটিয়া ফেলা হইল, তথাপি সাধু উপদেশ প্রদান হইতে বিরত হইলেন না।

এই গুহায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনার চিত্র অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। যেমন—এক স্থানে থামের আড়ালে একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পার্শ্বে এক বৃদ্ধের চিত্র। এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি বহু স্থানে দেখা যায়। এ গুহাতেও এক বিদেশীর ছবি অঙ্কিত আছে। সামনের বারান্দায় ছাদের তলদেশে পায়ে নীল রঙের উপর সাদা ডোরা-কাটা মোজা পরিহিত এবং মাথায় টুপি-পরা এক ব্যক্তির চিত্র যেমন অভিনব, তেমনি রহস্যাবৃত।

এই গুহায় আছে জননীর কোলে সন্তানের মূর্ত্তি। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্তে এই মাতৃমূর্ত্তিগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। যুগে যুগে 'ম্যাডোনা', 'মেরী কোলে যীশু', 'গণেশজননী' মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া থাকিবে। এক স্থানে আবার চারিহস্তবিশিষ্ট লাল রঙের গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

আর একটি চিত্রে একটি তরুণী, বোধ হয় নর্ত্তকী, মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার সমস্ত শরীর বেতস-লতার মত দোদুল্যমান—আঙ্গুলের ডগাগুলিতেও যেন কম্পনের

ভাব সুস্পষ্ট। সামনে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে এক নরপতি দণ্ডায়মান। কোন্ অপরাধে এমন কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত তাহা রহস্যাবৃত। কিন্তু চিত্রে নর্ত্তকীর সুকোমল নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেমন ভয়ের লক্ষণ তেমনি ক্ষমা-ভিক্ষার ভঙ্গীও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজার উপর অঙ্গ নষ্ট হইয়াছে, তাই তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখা যায় না। অজন্তার চিত্রে রমণীর পোষাক ও অলঙ্কার হইতে সহজে চিনিয়া লওয়া যায়—রাণী, বাজকন্যা, নর্ত্তকী বা সম্ভ্রান্ত মহিলাকে।

গুরুদাস সরকার মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "অজন্তার চিত্রমালায় উচ্চশ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত। এই শ্রেণীর স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি যেন নগ্ন বলিয়া মনে হয়। ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম কাপড় এ অঞ্চলে তখন কোথাও প্রস্তুত হইত কি-না জানি না, তবে রাজরাজড়ারা যে এইরূপ কাপড়ই পরিধান করিতেন তাহা শিল্পী উরুর উপর কোথাও সামান্য শ্বেত রঙের আভাস দিয়া, কোথাও বা সামান্য লাইনের দ্বারা পাড়ের আভাস দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। গিবনের ইতিহাস গ্রন্থে ভারতজাত স্বচ্ছ বস্ত্রে আবৃত রোমক রমণীদিগের উল্লেখ আছে। দাসী কঞ্চুকিনীরা ডোরাকাটা কাপড় পরিত—যেমন, সিঙ্গাপুর অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা 'সারঙ্গ' পরিধান করিয়া থাকে।"

এই গুহাতে মনোহর প্রস্তরের ছোট বড় যক্ষিনী

রমণীয় মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার মধ্যে কুবেরের মূর্ত্তির গঠন সুন্দর, চোখের টান যেমন আয়ত তেমনই ভাবব্যঞ্জক। ভিতরের গর্ভগৃহে বড় বড় ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রায় সব মূর্ত্তি পদ্মাসন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, মূর্ত্তির নিম্নভাগে ভক্ত, উপাসক, উপাসিকা, দানপতি ও দানপত্নীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। গুহার প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি মিথুনমূর্ত্তি দেখা যায়।

৩ নং গুহা—এই গুহাটি ছোট, ইহার স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। কেবল ইন্দ্রের একটি মূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা একটি অসম্পূর্ণ বিহার।

৪ নং গুহা—এই গুহাটিও একটি বিহার, ইহা অজন্তার বিহারগুলির মধ্যে সর্বচেয়ে বড়। ইহার দ্বার-দেশ মনোরম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পরিশোভিত। দ্বারের বহির্ভাগ নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং তাহার দুই পার্শ্বে প্রমাণ-আকারের দুইটি দ্বারপালের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই দ্বারদেশে একটি রমণীর মূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া নির্ম্মিত। রমণীর এক পা এক গাছের গুঁড়ি স্পর্শ করিয়া আছে। গুরুদাস সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এজাতীয় পরিকল্পনার মূর্ত্তি উড়িষ্যায় পাওয়া গিয়াছে (মন্দিরের কথা, ৩য় খণ্ড); গুহার বারান্দার মোটা থামগুলি অনাড়ম্বরশীল, কোনপ্রকার কারুকার্যমণ্ডিত নহে, তথাপি অতি মনোহর। থামের মাথ্‌লা সিংহাকৃতি জন্তুর মূর্ত্তির মুখদ্বারা অলঙ্কৃত। স্তম্ভারমের মধ্যে পনর ফিট উচ্চ পদ্মপাণি

বোধিসত্ত্বের বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার দুই পার্শ্বে ১০ ফিট উচ্চ দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, একটির হাতে পদ্ম, অপরটির হাতে চামর। তাহা ব্যতীত ৮´ হইতে ১২´ ফিট উচ্চ কয়েকটি মূর্ত্তি পর্ব্বতের গাত্রে খোদাই করা আছে। দেওয়ালে দুইটি গণমূর্ত্তি দেখা যায়, একটি বীণা ও অপরটি ঘণ্টা বাজাইতেছে। এই বিরাট গিরিগুহার দালানটি শত শত ভিক্ষু ও শ্রমণের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি, ও হস্তস্থিত ঘণ্টার নিনাদ মুখরিত করিত।

এই বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে এক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—

The calm dignity of the central figure with its complete absence of expression, creates in the beholder a feeling almost of annoyance when his eyes fall on the ravishing beauties, with their seductive forms and poignant faces, dancing or posing before the master in the vain attempt to awake his manhood or at least to shake his determination to pursue Nirvana. In sharp contrast to the unabashed minxes are the ugly ginning, taunting, and of fearsome figures of the ogres and demons in the upper portion of the fresco. One marvels how even the saintly

Buddha remained wholly passive and indifferent to the beauty below and the horrors above and that is just what the master mind intend to convey".

এখানের এক চিত্রে কতকগুলি মূর্ত্তি সাদা রঙের উপর ইটের মতন লাল রঙের রেখার ছায়াতে অঙ্কিত হইয়া অভিনব রূপ ও রং-ফলানর কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য-দালানের পার্শ্বের আটটি কক্ষে আট প্রকার অনিষ্টের প্রতীক—বন্য হস্তী, সিংহ, সর্প, শৃঙ্খলাবদ্ধ চোর, জলমগ্ন মানব ও রাক্ষসের মূর্ত্তি প্রাচীর গাত্রে খোদিত আছে। এই দালানটি চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট, আয়তন ৮৭´×৮৭´। ইহার স্তম্ভগুলির গঠন সরল কিন্তু স্তম্ভের উপরের সর্দ্দালের কারুকার্য্য চিত্তাকর্ষক।

৫ নং গুহা—ইহা একটি ছোট গুহা, ইহার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কয়েকটি অসম্পূর্ণ মিথুন-মূর্ত্তি প্রাচীর গ্রাত্রে খোদিত আছে মাত্র।

৬ নং গুহা—গুহাটি দ্বিতল। অজন্তার সকল গুহাগুলির মধ্যে ইহাতে সর্ব্বাধিক সংখ্যক বুদ্ধমর্ত্তি খোদিত আছে। এই চৈত্যের মধ্যে অতি মনোরম এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার সম্মুখে দুইটি কৃষ্ণসার। প্রবেশদ্বারের সর্দ্দালের উপর এক বৃহৎ হস্তিমূর্ত্তি। বাহিরের বারান্দায় একটি কুলঙ্গীতে অতি সুন্দর এক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির ভঙ্গী, চক্ষুর অভিব্যক্তি এবং খোদন-রীতি বুদ্ধদেবের বড় অপেক্ষা শিল্পগৌরবে কোন অংশে ন্যূন নহে।

অজন্তার বত্রিশটি গুহার মধ্যে এই গুহাটিই কেবল মাত্র দ্বিতল। সে যুগের আবাস-গৃহেরই পরিকল্পনায় পর্ব্বতের অভ্যন্তরেই নির্ম্মিত।

৭ নং গুহা—ইহাও একটি চৈত্যবিশেষ, এখানে মধ্যস্থলে অসমান আকারে চার দেওয়াল-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ কক্ষ। তাহার পেছনের দেওয়ালে সিংহাসনের উপর দশফিট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি। সিংহাসনটি খুব নীচু, তাহার তলে দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ, মধ্যে ছোট ধর্ম্মচক্র, তাহার দুই পার্শ্বে সশৃঙ্গ দুইটি হরিণ মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট, দক্ষিণ হস্ত অভয়-মুদ্রায় ঈষৎ উত্তোলিত এবং বাম হস্তের দ্বারা গাত্রাবরণ স্পর্শ করিয়া আছেন। শিল্পির অপূর্ব্ব দক্ষতা লোচনে প্রকাশ পাইতেছে। এই গুহার অভ্যন্তরে আরও কয়েকটি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এক স্থানে পদ্মাসনে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। অপর দিকের প্রাচীরগাত্রে প্রায় ১০৮টি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। এ যেন বুদ্ধময় জগৎ!

৮নং গুহা—এই গুহাটী অজন্তা গুহাবলীর মধ্যে সব চেয়ে পুরাতন বলিয়া মনে হয়। ইহার সম্মুখের অংশটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ইহার স্থাপত্য-গৌরব অতি অল্প। এই গুহার মধ্যে বর্ত্তমানে ইলেকট্রিক 'ডাইনামো' বসান আছে। গুহাটি দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

৯ নং গুহা—ইহাও একটি চৈত্যগুহা। খৃষ্টীয় প্রথম

শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহার দেওয়াল ও থামগুলি সরলভাবে শৈলবপু কাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে। তাহাদের উপর পাতলা আস্তর বা রং দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। এই দালানটির মধ্যে বিশটি মোটা মোটা স্তম্ভ আছে। স্থানটি যেমন প্রসস্ত তেমনই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। এখানে প্রাচীন যুগের একটি লিপি খোদিত আছে। ছাদতলে নানাপ্রকার লতাপাতা অঙ্কিত। ইহাদের নকাশী ও চিত্ররেখা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই মনোরম। অজন্তার চিত্রশিল্পীগণ রমণীর চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কত যত্ন করিয়া এঁরা এক একটি রমণীর মুখ শ্রীমণ্ডিত করিত। শ্রদ্ধা ছিল তাহাদের প্রধান উপকরণ। নারীর মুখ-ভঙ্গী, মাথার কেশ-বন্ধন, চোখের চাহনী, প্রসাধন-বৈশিষ্ট্য, চুল বাঁধার রীতি খুব মনোনিবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে তবে তাহা আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয়। অজন্তা-শিল্পীরা ছিলেন নারী-সৌন্দর্য্যের উপাসক। বাম দিকের শৈল-প্রাচীরে ছয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত। পশ্চাতের দেওয়ালে এক বড় বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। চিত্রে বুদ্ধ শিষ্য-মণ্ডলীকে ধর্ম্মবাণী শুনাইতেছেন। এক স্থানে পদ্মাসনে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। মাথার উপর মুক্তার রজ্জুতে একটি ছাতা ঝুলিতেছে। মাথার পিছনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতির ছটা প্রকাশিত হইতেছে।

১০ নং গুহা—এই গুহাটিও চৈত্য-বিশেষ। অজন্তার চৈত্যগুলির মধ্যে ইহা সব-চেয়ে আয়তনে বড়; ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে গঠিত। অভ্যন্তরে উচ্চ ছাদ। মোটা ৩৮টি

আটপলে স্তম্ভ সারি সারি ৮ফিট অন্তর অবস্থিত। ইহার মাথার ও পাড়ের নকসা ও কারুকার্য্য চিত্তাকর্ষক, স্তম্ভ-শ্রেণীর শেষ ভাগে একটি বৃহৎ স্তূপ। তাহার গাত্রে বুদ্ধের মূর্ত্তি। স্তম্ভশ্রেণী ও পর্ব্বত-প্রাচীর-গাত্রের মধ্যে 'তিন হস্ত প্রশস্ত প্রদক্ষিণ-পথ। বড় খিলানের ডান দিকে একটি লিপি খোদিত আছে। তাহার অক্ষরগুলি মৌর্য্যযুগের বলিয়া অনেকের ধারণা। অনুমান করা যায় যে এই গুহা খৃষ্টপূর্ব্ব দেড়শতকে নির্ম্মিত। কিন্তু গুরুদাস সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে "১০ নং গুহায় গৌরাকৃতি খিলানে একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপি আছে। ইহা হইতে নিজাম রাজ্যের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ মিঃ ইয়াজ-দানি অনুমান করিয়াছেন যে গুহাস্থ প্রাচীন চিত্রাবলীও এই লিপির সমসাময়িক"—অজন্তার চিঠি।

এই গুহাটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অঙ্কিত অনেক ভাল ভাল প্রাচীরচিত্র আছে। তাহার মধ্যে 'ছ-দন্ত জাতকের' কাহিনীর চিত্র উৎকৃষ্ট। প্রবেশপথের ডানদিকের প্রাচীরে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত। পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্ব শ্বেতহস্তি-রাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিভুবন বিচরণ করিতেন। তাঁহার ছয়টি দন্ত ছিল, ছয়টি দন্ত হইতে ছয় রকম আলোক-রশ্মি নির্গত হইত। সেই জন্য এই হস্তী 'ষড়দন্ত' নামে পরিচিত।

অন্য এক দেওয়ালে কবরীবন্ধনরতা এক নারীর চিত্র

অতি মনোরম ও নবপরিকল্পনায় অঙ্কিত। চিত্র রমণীদের কেশ-বিন্যাসের নকসা যেমন নব নব পরিকল্পনার তেমনই কেশ-প্রসাধনের ও কবরীবন্ধনের নানা রকম পদ্ধতিও প্রকাশ করে।

১১ নং গুহা—এই গুহাটি বিহার জাতীয়, সম্মুখের বারান্দাটি দ্বিতল। ইহার ছাদতলে অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত। গুহার বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত। তাহারই বামে দেওয়ালের উপর মনোহারিণী নারীমূর্ত্তি ও বহু লতাপুষ্পাদির চিত্র অজন্তার গুহার চিত্রশিল্পীদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এখানে ডোরাকাটা কাপড় পরা এক পরমা সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত। অন্যান্য গুহার ন্যায় ইহারও মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মূর্ত্তি ধর্ম্মচক্র-মুদ্রায় অঙ্কিত। এই গুহাটি এক সময় ভাণ্ডার রূপে ব্যবহৃত হইত।

১২ নং গুহা—এই গুহাটিও বিহারবিশেষ। তাহাতে ছোট ছোট বারটি কক্ষ আছে, প্রত্যেকটি কক্ষের দ্বারের উপর কারুকার্য্য দেখা যায়। ইহাতে কোন লেপ্যচিত্র অঙ্কিত নাই।

১৩ নং গুহা—ইহা একটি ছোট বিহার। অভ্যন্তরে গুটি কতক থাম ও শ্রমণদের বাসের কক্ষ আছে। কোন প্রকার কারুকার্য বা চিত্র ইহাতে নাই।

১৪ নং গুহা—ইহার বিশেষত্ব কিছুই নাই।

১৫ নং গুহা—এই গুহাটি নাতিদীর্ঘ। এখানে

অনেকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। ঘরের দুই পার্শ্বে মকরারূঢ়া গঙ্গা ও কচ্ছপারূঢ়া যমুনার মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুহার অভ্যন্তরে সিংহাসনে উপবিষ্ট দশ ফিট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি। স্তম্ভ-শীর্ষে "কীর্ত্তিমুখ" ও "গণমূর্ত্তি"।

ইহার প্রাচীরগাত্রে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত আছে। প্রাচীন যুগের গরুর গাড়ীর চিত্র ও মাথায় সাদা পাগড়ী-বাঁধা এক কবিরাজ, কোন মহিলার চিকিৎসা করিতেছেন, এই চিত্র সকল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৬ নং গুহা—ইহা একটি বৃহৎ সমচতুষ্কোণ দালান, চারি সারিতে দশ ফিট অন্তর বিশটি থাম। থামের মাথা ও পাড়ের তলায় কীচকের মস্তক। স্তম্ভগাত্রের কারুকার্য সুন্দর ও সূক্ষ্ম। থামগুলি ঘিরিয়া চারিদিকে প্রদক্ষিণ-পথ অবস্থিত। দালানের এক প্রান্তে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের এক বিরাট ধ্যানমূর্ত্তি? গুহার প্রাচীর ও ছাদনলে অতি মনোরম সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়া বিরাট দালানটির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। স্তম্ভগাত্রেও চিত্র অঙ্কিত আছে।

এখানে একটি আসন্ন মৃত্যু শয্যায় শায়িত রাজকুমারীর চিত্র যেমন হৃদয়-বিদারক তেমনই শিল্প-নিপুণতায় অপূর্ব্ব। মিঃ গ্রিফিথ সাহেব বলেন—"The Florentines could have put better drawing and Venitians better

colour, but neither could have thrown greater expression into it."

মরণোন্মুখী রাজকুমারী অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে ঘাড় লটকান অবস্থায় শয্যার উপর অসাড় দেহ এলাইয়া দিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে এক পরিচারিকা তাঁহার অবনমিত মস্তক ধরিয়া বসিয়া আছে। আর এক রমণী তাঁহার চক্ষু আশঙ্কায় বিস্ফারিত করিয়া মুমূর্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং তাহার বাম হস্ত নাড়ী পরীক্ষার অভিপ্রায়ে যেন ধরিয়া আছেন। কি আবেগপূর্ণ সেই মহিলার দৃষ্টি। যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিবে সেই আশঙ্কায় তিনি প্রতিক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন। পশ্চাৎভাগে আর একটি পরিচারিকা ব্যজন হস্তে সাগ্রহে দণ্ডায়মান। বাম পার্শ্বে দুইটি পুরুষ দণ্ডায়মান, তাহাদের মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া। নিম্নভাগে কয়েকটি আত্মীয় ও আত্মীয়া শোকে মুহ্যমান। এক রমণী নিজ বাহু মধ্যে মুখমণ্ডল রাখিয়া রোরুদ্যমানা। কি করুণ দৃশ্য এই চিত্রে শিল্পী তুলির আঁচড়ে ফুটাইয়াছেন! তাহা দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়।

ছাদতলে মুরগীর মতন এক দ্বিপদ পক্ষী এবং নানাপ্রকার জীবজন্তুর চিত্র আছে। মকর-মুখ নৌকা, অনন্তনাগ প্রভৃতির চিত্রগুলি নব পরিকল্পনায় অঙ্কিত।

শিশু ও জননীর চিত্রটি বিশ্বের মাতৃস্নেহ-ব্যঞ্জক চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। এই দৃশ্যের এক দম্পতির

চিত্রে চিত্তাকর্ষক কি সুন্দর ভঙ্গী! অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক!

এই গুহার বিখ্যাত চিত্র বুদ্ধ ও সুজাতার। বুদ্ধ তপস্যায় রত, তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। গ্রাম্য বালিকাটি তাঁহাকে পরমান্ন নিবেদন করিতেছেন। অজন্তার এই অজ্ঞাত শিল্পীর অমর চিত্র বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও অনুপ্রেরণা দিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত বুদ্ধ ও সুজাতার চিত্রটিও চির আদৃত হইয়া থাকিবে এবং যুগে যুগে বুদ্ধের মহিমা ঘোষণা করিবে। এ গুহার মধ্যে মায়া-দেবীর স্বপ্নের চিত্রও মনোরম।

১৬ নং গুহায় বাক্যাটক বংশের এক রাজার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুহার সম্মুখে নদীগর্ভ হইতে সোজা খাড়াই ভাবে পাহাড় কাটিয়া এক প্রস্ত সিঁড়ি উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে; এই সিঁড়ি নদী হইতে জল আনিবার জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার খাড়াই প্রায় শতফিট হইবে। নদী তীরের রাস্তা হইতে উঠিয়া গুহায় প্রবেশ করিবার ইহাই একমাত্র পথ। ইহারই সম্মুখে জলপ্রপাত অবস্থিত।

বুদ্ধের সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে রথে করিয়া তাঁহার নগর-ভ্রমণ, ব্যধি-জরা-মৃত্যু ও দারিদ্র্যের দৃশ্য দর্শনে চিত্তে বৈরাগ্যের ভাব উদয়ের চিত্র চিত্তাকর্ষক।

১৭ নং গুহা—ইহা একটি বড় গুহা। প্রাচীর ও ছাদতলের বিভিন্ন অংশ নানা চিত্রে শোভিত। এত অধিক

চিত্র আর কোন গুহায় নাই। অপ্সরাগুলির চিত্র বিভিন্ন অবলম্বনে অঙ্কিত।

গুহার মধ্যভাগে চতুষ্কোণ বড় দালান এবং তাহার দুই দিকে দুইটি প্রশস্ত সংলগ্ন কক্ষ। দালামের প্রান্তে বার ফিট্ উচ্চ ভূমি-স্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজমান। এই গুহাটি অধুনা 'রাশিচক্র গুহা' নামে পরিচিত। কারণ ইহার বারান্দার ছাদতলে একটি প্রকাণ্ড 'রাশিচক্র' সুনিপুণ হাতে অঙ্কিত আছে। দ্বাদশ রাশির প্রতীক মূর্ত্তিগুলি অতি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে চিত্রিত।

গুহার পূর্ব্ব-প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত অশোক-নন্দনী রাজকুমারী ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রার বোধিদ্রুমসহ সিংহল যাত্রার বৃহৎ চিত্র অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও মনোরম। চিত্রটি সুসংস্কৃত ও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। কলিঙ্গ আক্রমণের সময় একদল নারীযোদ্ধার রণসজ্জার দৃশ্যটি যেমন বীরত্ব-ব্যঞ্জক তেমই সমুজ্জল। প্রবেশ দ্বারের দেয়ালের উপরিভাগের উড়-পটীতে আটটী বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত। দ্বারের ডানদিকে শ্যামল ক্ষেত্র, নদী, পর্ব্বত ও বনস্পতিপূর্ণ একটি অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত আছে।

বারান্দার দেওয়ালে দাঁড়ান এক নারীমূর্ত্তি, মুরগী ও ভেড়ার লড়াই, রাজা ও রাণীর হাস্যকৌতুক, নটীদের নৃত্য, রমণীগণের প্রসাধন, নূপুর পায়ে নর্ত্তকীগণ, নীলাম্বরী সা'ড়ি পরা একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর চিত্রগুলি শিল্প-কলার শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন। তবে এই ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত পয়বর্ত্তী যুগের বলিয়া অনুমান হয়।

প্রাচীন ধারার চিত্রগুলি বিভিন্ন জাতকের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। বুদ্ধদেবের জীবন লীলার চিত্রগুলি কেবল চিত্র-ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত নহে, সমস্তই লোকশিক্ষার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছিল। ১৭ নং গুহার নির্ম্মাণ কাল চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত।

১৮ নং গুহা—এই গুহাটির দ্বারমণ্ডল কেবল কারুকার্য্য মণ্ডিত, উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই।

১৯ নং গুহা—ইহা একটি বৃহৎ চৈত্যগুহা, অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে খোদাই ভাস্কর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই চৈত্যের স্থাপত্য ও নকাসির অনুকরণে, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার (গোলদিঘির) পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজিকা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সিংহলবাসী পূজ্যপাদ অনাগরিক-ধর্ম্মপাল মহাশয়ের উদ্যোগে এই বিহার স্থাপিত হয়। স্থপতি-বিশারদ মনমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। লেখকেরও নির্ম্মাণ পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল।

১৯ নং গুহা—ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, অভগ্ন ও সুরক্ষিত অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান। পাশ্চাত্ত্য এক পণ্ডিত বলেন—
It is one of the most perfect specimens of Buddhist (chaitya) art in India. It is a good example of a chaitya holly built in stone.

গুহাটির সম্মুখভাগ দ্বিতল। অভ্যন্তরে আঠারটি মোটা স্তম্ভ খোদিত হইয়াছে। প্রতি স্তম্ভের মাথায় আম্র ও দ্রাক্ষাফল-গুচ্ছমণ্ডিত; কয়েকটি কুলঙ্গী বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে নানা মুদ্রায় যোগাসনে-বসা বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। তাহার উপর পাঁচ ফিট মোটা কারুকার্য্যমণ্ডিত পাড় অবস্থিত। তাহার উপর হইতে গৌরাকৃতি খিলান পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত। মানবের পঞ্জরের ন্যায় বিমগুলি কর্ত্তিত হইয়াছে।

গুহার প্রান্তভাগে ত্রিশ ফিট উচ্চ এক-শিলার গঠিত 'ডগোবা' স্থাপিত। তাহার সম্মুখভাগে দশ ফিট উচ্চ, দণ্ডায়মান এক বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত। 'ডগোবার' শিরোপরি তিন থাক ছত্র অবস্থিত। ডগোবা সিংহলি শব্দ, অর্থ ধাতুগর্ভ (সেখানে পূজনীয় ব্যক্তির পবিত্র অস্থি সংরক্ষিত হয়) 'ডগোবা' বৌদ্ধ-স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

গুহার বহির্দ্দেশে ডান দিকে একটি বড় দণ্ডায়মান বুদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই মূর্ত্তি যবদ্বীপের বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। এই গুহার মধ্যে চক্রাকার এক বৃত্তের মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। সেগুলি গুপ্তযুগের শিল্প-ধারার প্রকৃষ্ট পরিণতির এক উদাহরণ। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রমাণ আকারের দুইটি দ্বারপালের মূর্ত্তি খোদিত আছে। উপরের কুলঙ্গীতে কুবেরের মূর্ত্তি।

২০ নং গুহা—এই বিহার-গুহাটি চিত্তাকর্ষক ও নানা ভাস্কর্য্যপূর্ণ। ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের বৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত।

দেওয়ালে সারিসারি অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। রাজা ও রাণীর প্রেমালিঙ্গন, নাগ ও নাগিনীর একত্র বিহার, অপ্সরার নৃত্য চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য, শিল্পীর রসসৃষ্টির এবং নিপুনতার পরিচায়ক। একটি চিত্রে জননী সন্তানসহ বুদ্ধদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে যাইতেছেন। ইহাদের চোখ ও মুখের ভাব, পরিকল্পনা, গঠন-কৌশল অতি সুন্দর। সারি সারি অপ্সরা-মূর্ত্তি অতি কৌশলে খোদিত হইয়াছে।

২১ নং গুহা—ইহা একটি বৃহৎ বৌদ্ধ-মঠ, অভ্যন্তরে বড় একটি দালান ও সম্মুখে দ্বারমণ্ডপ। ৪ ফিট ব্যাসের মোটা মোটা স্তম্ভগুলি ছাদের ভার বহন করিতেছে। এই প্রধান দালানের সহিত ছয়টি বিশ্রাম-কক্ষ, প্রত্যেকটির সহিত এক একটি পার্শ্ব-কক্ষ যুক্ত থাকাতে অজন্তা-স্থাপত্যে এক নূতন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছে। গুহার ভিতরে মধ্যস্থলে বার ফিট উচ্চ কমললোচন বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। বামদিকের এক প্রকোষ্ঠে নাগরাজের চিত্রও চিত্তাকর্ষক।

২২ নং গুহা—ইহা একটি ছোট বিহারজাতীয় গুহা। ইহার সংলগ্ন চারিটি অসম্পূর্ণ কক্ষ। গুহার উপরিভাগে রংকরা ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি চিত্তাকর্ষক। লালরেখার টানের সহিত শ্বেতবর্ণের সমাবেশ অতি মনোরম। একস্থানে বুদ্ধের কমনীয় মূর্ত্তি এবং দুই পার্শ্বে ব্যঞ্জনধারিণী মহিলাদ্বয়ের চিত্র অতি সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত। কক্ষের মধ্যস্থলে পাঁচ ফিট উচ্চ এক বুদ্ধমূর্ত্তি যাহার চরণদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর রক্ষিত।

বুদ্ধের ডানদিকে পদ্মপাণি ও বামে এক উপাসিকার মূর্ত্তি খোদিত।

২৩ নং গুহা—ইহা একটি বিহার, এই বিহার-গুহাটি 'পদ্ম গুহা' নামে পরিচিত। মনে হয় এক মত্ত হস্তী এই গুহাটিকে শুণ্ডে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মধ্যের থামগুলি বেশ মোটা এবং কারুকার্য্য-মণ্ডিত।

গুহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বৃত্তাকারে পরিকল্পিত পদ্মপুষ্প এবং বৃত্তমধ্যে সংস্থাপিত ময়ুর ও মকরমূর্ত্তি অতি মনোরম। বারান্দার প্রাচীর-গাত্রে এখনও কয়েকটি চিত্র দেখা যায়, তাহার মধ্যে রাজা ও রাণীর বাক্যালাপ এবং চামরধারিণী পরিচারিকাগণের চিত্র উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গুহাটি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২৪ নং গুহা—ইহা একটি অসম্পূর্ণ গুহা। ভিতরে কোন কারুকার্য্য বা চিত্র নাই। বাহিরের প্রাচীরের উপর মিথুন মূর্ত্তি, উড্ডীয়মান অপ্সরা, মকরবাহিনী গঙ্গা প্রভৃতি খোদিত আছে।

২৫ নং গুহা—ইহা বৃহৎ আয়তনের একটি বিহার। সম্মুখের প্রবেশ-দ্বারে খুব কারুকার্য্য করা আছে বটে, কিন্তু ভিতর অন্ধকার, আলোক-প্রবেশের পথ অতি সংকীর্ণ। অভ্যন্তরে পর্ব্বত-ছাদের অবলম্বন-স্বরূপ কয়েকটি মোটা মোটা থাম অবস্থিত। প্রাচীর-গাত্রে ও ছাদতলে নানা চিত্র অঙ্কিত আছে।

উপরাংশের মধ্যস্থলে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট, ডান ও বাম দিকে দুইজন পরিচারিকা দণ্ডায়মান। বৃত্তাকৃতি কতগুলি খোদিত নারী-মূর্ত্তি এবং দর্পণ ও ব্যঞ্জন-হস্তে রমণী মূর্ত্তিগুলি চমকপ্রদ।

২৬ নং গুহা—এই গুহা অজন্তায় যে চারিটী বৌদ্ধ চৈত্য আছে তাহারই অন্যতম। চৈত্য মধ্যে উপাসনাগৃহটি ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট; ইহার ছাদ অর্দ্ধ-বৃত্তাকৃত, পাহাড়কাটা পাথরের বিমগুলি যেন মানবের পাঁজরার মতন দেখায়। আলোক-প্রবেশের বাতায়ন-মধ্য দিয়া গুহার দালানের প্রতি অংশে আলো প্রবেশ করে। ইহার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য নানা আকারের; নানা মুদ্রার, নানা ভাবের খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহার স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য্য অতুলনীয়। দালানের মধ্যে এক প্রাচীর-গাত্রে বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণের বিরাট দৃশ্য খোদিত আছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তথাগতের শির স্থাপিত। আজানুলম্বিত বাহু দেহোপরি লম্বিত। চরণদ্বয় এবং নখরগুলি সুন্দর রূপে খোদিত। বহু ভিক্ষু বুদ্ধকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শোকের ছায়া তাহাদের মুখমণ্ডল ম্লান করিয়াছে। পদতলে অনেক ভক্ত নরনারীর মুহ্যমান মূর্ত্তি। অজন্তার শিল্পীগণের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

এখানে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, গুহাটি বুদ্ধভদ্র নামে একটি বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দালানের মধ্যে ২১´ উচ্চ একটি ধাতুগর্ভ স্থাপিত। ইহার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত। মধ্যস্থলে ১৬´ উচ্চ বুদ্ধের দণ্ডায়মান সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি। তাহার অঙ্গাবাস বাম স্কন্ধ হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বিত। ডান স্কন্ধ অনাবৃত।

ছাদতলে এবং প্রাচীর-গাত্রে বুদ্ধের-জীবনলীলা ও তদানীন্তন সমাজের নানা চিত্রাবলী অঙ্কিত। অসিত মুনির কোষ্ঠিবিচার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকাশ্য স্থানে উচ্চ আসনে মুনিবর উপবিষ্ট, মাথার উপর বিহঙ্গ-পিঞ্জর ও একটি বাদ্যযন্ত্র বিলম্বিত। মুনির হাতে এক খণ্ড মোটা কাগজ, বামদিকে কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও মহিষী উপবিষ্ট; রাজা দুই করে রাজ-শিশু ধরিয়া মুনির সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন।

চৈত্য-গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে জীর্ণ প্রকোষ্ঠে বুদ্ধ মার দ্বারা আক্রান্ত লীলার ও বাম পার্শ্বের ঘরটীর মধ্যে নয়টী অনুচর দ্বারা পরিবৃত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র বিরাজিত।

২৭ নং গুহা—ইহা একটি ছোট বিহার, যাহাতে কিছু কিছু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে। গুহার দিকে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি। স্তম্ভ-গাত্রে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত সঙ্গিনীসহ উপবিষ্ট নাগরাজ মূর্ত্তি।

২৮ ও ২৯ নং গুহা—এই দুই গুহায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। ইহাদের নির্ম্মাণকাল ফার্গুসান সাহেব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট

উপসংহার

অজন্তাগুহাগুলি ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও প্রাচীর চিত্রের জন্য বিখ্যাত। বিশেষতঃ প্রাচীর-চিত্রাবলীই অজন্তার বৈশিষ্ট্য। চিত্র-অঙ্কনের পদ্ধতি যেমন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর তেমনই রেখা-বিন্যাস সূক্ষ্ম, রঙের উজ্জ্বলতা ও স্থায়ীত্ব বিস্ময়কর, রঙের উপাদন সাধারণ, সমস্তই স্থানীয় খনিজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত। অজন্তার ছবিগুলিতে যে সবুজ রঙ দেখা যায় তাহা ও লাল গিরিমাটী রং পাহাড়েই পাওয়া যায়। এখনও সবুজ পাথরের ঢেলা অজন্তা অঞ্চলে মিলে। এই সবুজের বর্ণাভাস প্রত্যেক ছবিতেই প্রতিভাত। লাল ও সবুজ মিলাইয়া পীতবর্ণ প্রস্তুত করা হইত। সে যুগে নীল রঙও ভারতে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইত। চিত্রের রং স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার উপাদান সবই এই দেশে পাওয়া যাইত। বার শত হইতে দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত ছবিগুলি প্রকৃতির পীড়নে এখন ম্লান বা নষ্ট হয় নাই। মনে হয় সদ্য অঙ্কিত। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত রংদ্বারা অঙ্কিত তৈলচিত্রও দু এক শত বৎসরেই বিবর্ণ হইয়া যায়। উজ্জ্বলতা হারায়।

অজন্তার শিল্পিগণের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের নানা বিষয়ে একই সময়ে চিত্র-অঙ্কনের পারদর্শিতা। এদিকে

যেমন অবলোকিতেশ্বরের, বোধিসত্ত্বের, পদ্মপানীর কমনীয় অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত, তেমন অপরদিকে গায়ক, নর্ত্তকী, রাজা-রাণী, অপ্সরার চিত্র অঙ্কনে নিপুনতা প্রকাশিত। এক নম্বর গুহার নাগ-রাজ ও রাজ্ঞীর এক চিত্রে অজন্তার শিল্পীর এই প্রকার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাণী এমন করুণ দৃষ্টিতে রাজার মুখপানে চাহিয়া আছেন যে, আত্মনিবেদনের ভাব যেন উদ্ভাসিত হইয়া প্রেমাস্পদের চরণে ঢালিয়া দিতেছেন। উভয়ের দৃষ্টিতে কি গভীর ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি আত্মবিনিময়ের কি অপূর্ব্ব ভাব বিচ্ছুরিত হইতেছে। এইরূপ শিল্পসৃষ্টি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের শিক্ষার ও ত্যাগের প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। শুষ্ক-হৃদয় বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরা এমন সরস চিত্রঅঙ্কনে কি অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারিতেন যদি না তাঁহারা সত্যের, শিবের, ও সুন্দরের সন্ধান পাইতেন? প্রকৃতি ও মানবজীবনের সৌন্দর্য্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইতেন, জীবনটাকে কেবল মরীচিকা মনে করিয়া জপ, তপ, ধর্ম্ম সাধন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন "অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্য্যের একটি ক্ষুদ কুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে জোটে নেই, কিন্তু অজন্তার গুহার ভিত্তি-চিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে' যুগান্তরে আপনবাণীকে প্রচার করে চলেছে। (অসিত হালদারের বাগ গুহার ভূমিকা।)

অজন্তার শিল্পী রমণী-চিত্রে নানা রস ফুটাইয়া, অমর। আনন্দময়ী রূপে, ভগ্নীরূপে, জননীরূপে, সহচরীরূপে, প্রণয়িনীরূপে চোখের টান আঁকিয়া এক অপূর্ব্ব সুষমা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। সত্য ও সুন্দরের বিকাশ হইয়াছে। হাতের ভঙ্গী, গ্রীবার গঠন, চোখের টানের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে অজন্তার শিল্পীদের সৃষ্টি দেখিতে হয়। তাঁহারা খণ্ড ছবি আঁকিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, নানা রকমের ও বিভিন্ন প্রকার ঘটনা প্রকাশের জন্য এক সূত্র অবলম্বনে দৃশ্যের পর দৃশ্য আঁকিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের জন্মলীলার চিত্র, জাতকের কাহিনীর চিত্র, সিংহল-অবদানের চিত্র ঘটনার পর ঘটনা অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্যপট আঁকিয়া চলিয়াছেন। ছবির গায়ে ছবি একটানা চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের দৃশ্যে নৌকা, কড়ি, শঙ্খ, জলচর জীব আঁকিয়া জলধির স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার অট্টালিকা দেখাইবার সময় সরু থাম আঁকিয়া তাহার উপর রেখা টানিয়া ছাদ দেখান হইয়াছে। ইটের স্তূপ বা ভাঙ্গা সৌধ-স্তূপ আঁকিয়া পাহাড়ের পরিকল্পনা করা হইত। চিত্রগুলি দেখিলেই মনের উপর গভীর আনন্দের ছাপ পড়িয়া যায়। শিল্পীর মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়।

অজন্তার চিত্রাবলী বেশীর ভাগই বৌদ্ধ জাতক-কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। পুরাণের ন্যায় জাতক কাহিনীর রচনার মূল উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। মানব-হৃদয়ে সদ্‌বৃত্তি জাগরিত ও

পাষাণ হৃদয়ে দয়া মমতার বীজ উপ্ত করিবার জন্য এই সকল কাহিনীর সৃষ্টি।

সকল ধর্ম্মসাধনের মূলে দান ও স্বার্থত্যাগ। গৃহস্থের দান ব্যতিরেকে কি জ্ঞানী, কি ভিক্ষু, কি সন্ন্যাসী সৎধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচার করিতে পারেন কি? কোন লোক হিতকর কার্য্যও অর্থ ছাড়া করিতে পারে না। ত্যাগ ও দান যে মানবের একটী বড় ধর্ম্ম তাহাই অজন্তার শিল্পীগণ চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাই অজন্তার শিল্পীর আর এক বৈশিষ্ট্য। অজন্তার গুহার কন্দরে কন্দরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইত-রবীন্দ্রনাথের সেই আকুলতাপূর্ণ বাণী।

"ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ॥
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"

বন্দেমাতরম্

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

দক্ষিণ ভারত পথে	... ...	মূল্য	২.
ভারতের দেব দেউল (বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)		„	৩.
বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্র নাথ	... .	„	৩.৫০
চার পুণ্য স্থান (মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত)		„	১.
স্মৃতি কণা	... .	„	১.
হেমলতা ঠাকুর (জীবনী)	... ...	„	

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

দক্ষিণ ভারত পথে ... ... মূল্য

ভারতের দেব দেউল (বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) „ ৩

বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্র নাথ ... . „ ৩'৫৹

চার পুণ্য স্থান (মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত) „ ১৲

স্মৃতি কণা ... . „

হেমলতা ঠাকুর (জীবনী) ... ... „